আমেরিকা

স্টীফেন ভিনসেণ্ট বেনে লিখিত অন্যান্য পুস্তক

গদ্য

দি বিগিনিং অব্ উইজ্‌ডম
ইয়ং পিপল্‌স্ প্রাইড্
জিন হিউগুনট
স্প্যানিশ বেয়নেট
জেম্‌স্ শোরস্ ডটার
দি ডেভিল অ্যাণ্ড ড্যানিয়েল ওয়েব্‌স্টার
থার্টিন ও’ক্লক
জনি পাই অ্যাণ্ড দি ফুল-কিলার
টেল্‌স্ বিফোর মিড্‌নাইট

পদ্য

ফাইভ মেন অ্যাণ্ড পম্পে
টাইগার জয়
হেভেন্‌স্ অ্যাণ্ড আর্থ
জন ব্রাউন্‌স্ বডি
ব্যালাড্‌স্ অ্যাণ্ড পোয়েম্‌স্
বার্নিং সিটি
ইয়ং অ্যাডভেনচার
এ বুক অব্ আমেরিকান্‌স্
(রোজমেরী বেনের সহযোগে)
নাইটমেয়ার অ্যাট নূন
দে বার্ণড্ দি বুক্‌স্
ওয়েস্টার্ন স্টার

সঞ্চয়নী

ভল্যুম ওয়ান : পোয়েট্রি
ভল্যুম টু : প্রোজ

লিব্রেটো

দি ডেভিল অ্যাণ্ড ড্যানিয়েল ওয়েব্‌স্টার

স্টীফেন ভিনসেন্ট বেনে
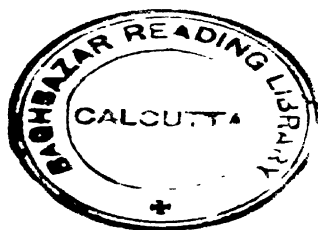
আমেরিকা

রাইনহার্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী, ইন্‌ক্

নিউইয়র্ক টরোণ্টো

স্টীফেন ভিন্‌সেণ্ট বেনে প্রায়ই এইকথা বলিতেন যে, অন্যান্য দেশের লোক আমাদের দেশকে ভাল করিয়া চিনিতে ও বুঝিতে পারিবে যদি তাহারা এই দেশে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়, আমাদের আচার ব্যবহার ও ইতিহাসের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ঘটে এবং তাহারা আমাদের বক্তব্য শুনিতে ও আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে।

১৯৪২ সালের শীতকালে সমর সংবাদ কার্যালয় হইতে প্রস্তাব করা হয় যে, মিঃ বেনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এমন একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করুন যাহা নানা ভাষায় অনুবাদ করা যাইতে পারে। মিঃ বেনে সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কাজ আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা শেষ করেন।

দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও আমেরিকার স্বাধীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তিনি এই পুস্তক রচনা করেন। এই কারণে আমরাও বিশ্বাস করি যে, তাঁহার এই গ্রন্থ 'আমেরিকা' আমেরিকানদের মধ্যে অতীত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস পুনঃসঞ্চার করিয়া নিখিল বিশ্বে আমেরিকার যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে সাহায্য করিবে।

প্রকাশকবৃন্দ

সূচী

আমেরিকা	৩
সমুদ্রের উপর দিয়া বীজ উড়িয়া গেল	৮
বিপুল সংখ্যায় ঔপনিবেশিকদের আগমন	২০
বিপ্লব	৩৫
সংবিধান	৫০
দেশের স্তম্ভ যাঁহারা	৫১
শিশু সাধারণতন্ত্র	৫৯
আব্রাহাম লিঙ্কন	৮২
গৃহযুদ্ধ	৮৯
পুনর্গঠন	৯২
তামা ও সীসার যুগ	৯৬
বিশ্বশক্তিরূপে উন্নীত	১০৬
যে আমেরিকাকে আমরা জানি	১১৫
আমেরিকা ও পৃথিবী	১২২
যুদ্ধের পরে	১৩৬

আমেরিকা

মানুষের আশা আর স্বাধীনতার এক দেশ আছে। সেই দেশের উদার আকাশের তলায় পৃথিবীর সকল দেশের বিভিন্ন জাতির লোক সমবেত ভাবে বাস করে। যে কোন উপাসনা মন্দিরে তাহারা যাইতে পারে; ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট, ইহুদী, ইসলাম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তিই সেদেশে ধর্মবিশ্বাসের জন্য লাঞ্ছিত হয় না। এই দেশের নরনারী নিজেদের শাসনকার্যের জন্য নিজেরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যদি তাহারা মনে করে প্রতিনিধিরা অসঙ্গত ভাবে কার্য পরিচালনা করিতেছে, তখন প্রয়োজন বোধে তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভোটের দ্বারা, বিপ্লবের দ্বারা নহে। সকল সময়েই তাহারা নিজেদের সরকার ও নিজের দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই মত কার্যেও পরিণত করে। কিন্তু তাহারা সব সময়েই এক আদর্শ, এক দেশ এবং এক পতাকার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে।

তারকা ও বিচিত্ররেখা লাঞ্ছিত সেই পতাকা। সেদেশের নাম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশের একমাত্র আদর্শ গণতন্ত্র।

এই দেশ মর্ত্যের স্বর্গ নয়, ইডেনের উদ্যান নয়, কিংবা ইহাকে সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপেও অভিহিত করা হয় না। এই শ্রেষ্ঠত্বের কোন ভানই এ দেশ করে না।

মানুষের জীবনযাত্রার সকল সমস্যার সমাধান এই দেশ করিতে পারে নাই। নিজের দেশের এবং পৃথিবীর বিবিধ সমস্যার ব্যাপারে এই দেশ ভুলও করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দেশ ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছে সেই দিনটির প্রতীক্ষায়, যেদিন প্রত্যেক নর নারী স্বাধীনভাবে জীবন-

যাপন করিতে পারিবে, প্রত্যেকের জন্য কর্ম ও অন্নের সংস্থান হইবে, যেদিন মানুষের বংশধর নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে পারিবে।

এই দেশ সারা দুনিয়া শাসন করিতে চায় না; এই দেশ চায় না মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পৃথিবীর অন্য সব জাতি বাস •করুক, এবং কেবল মার্কিণীরাই তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। আপনি যদি কোন আমেরিকা-বাসীকে প্রশ্ন করেন, তিনি প্রভুর জাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন কিনা, তাহা হইলে তিনি আপনার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিপাত করিবেন নতুবা অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। মার্কিণ দেশবাসীরা প্রভুর জাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করে না।

আমেরিকা সংগ্রামী দেশ, সংগ্রামের মধ্যে তাহার জন্ম, সংগ্রামের মধ্য দিয়া এ দেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য এদেশ সর্বদাই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। আজ পর্যন্ত কোন যুদ্ধেই এ-দেশ পরাজিত হয় নাই। কিন্তু আমেরিকা ইহাও বিশ্বাস করে না যে যুদ্ধ এবং জঙ্গীবাদই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। যাঁহারা এই দেশের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই সব বীর যোদ্ধা ওয়াশিংটন, গ্র্যাণ্ট ও লী-র পুণ্যস্মৃতির প্রতি এদেশ-বাসীরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, যেমন তাহারা সম্মান দেখায় তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা আজও দেশের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এই সব সংগ্রামীরা শুধুমাত্র জয়লাভের জন্যই যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা ইহার চেয়েও বৃহত্তর কিছু আশা করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানের পর তাঁহারা বলিয়াছিলেন: "আমরা শান্তি চাই। আমরা দেশকে গড়িয়া তুলিব। আমরা এমন কিছু গড়িয়া তুলিব, এমন কিছু লালন করিব যাহা এদেশে পূর্বে ছিল না। আমরা এমন এক দেশ গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছি, যে-দেশে মানুষ প্রতিবেশীর প্রতি মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিবে।"

কোন কোন বিষয়ে আমেরিকা একটি আজব দেশ। পৃথিবীর জাতি-সমূহের মধ্যে ইহা কনিষ্ঠতম। কিন্তু এই দেশের শাসনতন্ত্র দেড় শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সংশোধন

তাহাতে করা হইয়াছে কিন্তু মূল নীতির পরিবর্তন ঘটে নাই। বর্তমানে হোয়াইট হাউসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বাত্রিংশত্তম প্রেসিডেণ্ট অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অষ্টসপ্ততিতম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছে। জনগণের ইচ্ছাতেই তাঁহারা এই ক্ষমতার আসনে বসিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে আজ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছাই কার্যকরী রহিয়াছে এবং জনগণই এখন পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে। সেই প্রথম হইতেই আমেরিকার জনগণ নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিবার অধিকার লাভ করিয়া আসিয়াছে, নিজেরা ভুল করিয়াছে এবং নিজেরাই তাহার সংশোধন করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'জনগণ' বলিতে আমেরিকায় কোন একটি বিশেষ শ্রেণী, বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় না। এই জনগণের সংজ্ঞা বলিতে আমাকে, আপনাকে, আপনার প্রতিবেশী — কসাই, রুটিওয়ালা, কৃষক, মজদুর, আইনজীবী, ডাক্তার, ঘরের ঝি সকলকেই বোঝায়। আমেরিকায় প্রত্যেকটি নাগরিকই জনগণের অংশ।

এইরূপ শাসনব্যবস্থার ফলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী ও বিত্তশালী হইয়া একটি সুবৃহৎ শিল্পপ্রধান দেশ এবং বিরাট শস্যভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। যেদেশেই কখনো বন্যা কিংবা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে, ভূমিকম্প কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় যখনই অন্য কোন দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে, তখনই সেই সব অঞ্চলে মার্কিণ খাদ্যসম্ভার, ঔষধপত্র এবং ডাক্তার, নার্স প্রভৃতি দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। নিজেদের কর্তব্যবোধেই তাঁহারা সেখানে গিয়াছেন।

আমাদের শত্রুদের কাছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোটিপতি ধনিক, দস্যু, দুর্বলচিত্ত মানুষ, সিনেমার তারকা, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ, আলস্য-পরায়ণা নারী এবং অনশনক্লিষ্ট, স্বার্থান্ধ সর্বহারা অধ্যুষিত এক দেশ। আমরা আমেরিকাবাসীরা তাহাদের এই উক্তির কোনটার জন্যই কিছু মনে

করি না। আমাদের দেশের প্রতি অনুগত ও অনুরক্ত জীবিত কিংবা মৃত মার্কিণ নাগরিক নিজের দেশ সম্পর্কে — যেদেশকে আমরা এত প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি — যেসব কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহার চেয়ে কঠোরতর ও তীব্রতর সমালোচনা আমাদের শত্রুরাও করিতে পারিবে না।

এই যুদ্ধে সংগ্রামরত প্রত্যেক মার্কিণ সৈন্যই নিজের মাতৃভূমির আদর্শের জন্যই লড়াই করিতেছে। কোন কোন সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে এই আদর্শের অপব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারে, এমন কি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করিতে পারে। কিন্তু সেই আদর্শ চির-অম্লান। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেবদূতের এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছি বলিয়া দাবী করি না। তাহারা আমেরিকার সাধারণ মানুষ, স্বাধীনভাবে তাহারা পালিত হইয়াছে, এখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। এইটুকুই আমাদের বক্তব্য। অনেক ধরণের মানুষ সেখানে আছে, কেহ লম্বা, কেহ বা বেঁটে, কারও রঙ্ কালো, কেহ বা ফর্সা, কেহ কথা বলে বেশী, কেহ থাকে নীরব — কেহ কাজ করে হাতে, কেহ করে মস্তিষ্কের সাহায্যে, কেহ ছোট শহরের অধিবাসী, কেহ বা মহানগরীর নাগরিক, কেহ বা- আসিয়াছে কৃষক জীবনের শান্ত পরিবেশ হইতে — সকল রকমের মানুষই সেখানে রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সকলের পশ্চাতেই রহিয়াছে একটি আদর্শ, সেই সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হউক কিংবা না-ই হউক। একটি আদর্শ এবং একটি চিন্তাধারাই সর্বদা কাজ করিতেছে।

এই আদর্শের স্বরূপ কী? মার্কিণ আদর্শ ও মাকিণ চিন্তাধারার পরিচয় কী? কবে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল? কে ইহার স্রষ্টা? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র অটমোবিল, রেডিও, আইসব্যাগ, সিনেমা প্রভৃতির উৎপাদনকারী বিরাট ধনীর দেশ হিসাবেই নহে, পৃথিবীতে একটা প্রাণবান শক্তিরূপে তাহার পরিচয় কী?

আমাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ঘটনাসমূহ বিচার

করিয়া দেখিতে হইবে। যদি আপনি কোন ব্যক্তির পরিচয় জানিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাকে তাহার পিতৃপরিচয়, তাহার পরিবারের পরিচয়, তাহার গৃহপরিচয় এবং কোন্ পরিবেশে সে মানুষ হইয়াছে তাহার পরিচয় জানিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও সেই পরিচয় আমাদের জানা দরকার। কেমন করিয়া এই দেশের জীবনযাত্রা সুরু হইল এবং কেন?

সমুদ্রের উপর দিয়া বীজ উড়িয়া গেল

••••••••••••••••••••••••••

দুইটি ক্ষুদ্রদলের দৃঢ়মনা মানুষ অরণ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিল— একটি ভার্জিনিয়ার জেমস্‌টাউনে, অন্যটি মাসাচুসেটসের প্লিমাউথে। এই সংগ্রামের মধ্যেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন।

কিন্তু ইহারাই উত্তর আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশসন্ধানী মানুষ নহেন। তাঁহাদের এক শতাব্দীরও আগে সন্ধানীরা আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই বিখ্যাত স্পেনদেশীয় আবিষ্কারক দ্য সোটো, কোরোনাডো, কাবেজা দ্য ভাকা এদেশে পদার্পণ করিয়া বহু জায়গা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং দুঃখও বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই বহির্বিশ্বে আমেরিকার দূর-প্রসারী সমতলভূমি, প্রবহমানা বিরাট নদী এবং রেড-ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত অরণ্যাঞ্চলের কথা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই ফরাসী-দেশের দুঃসাহসিক মৎসশিকারীরা গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক-এর সন্ধান লাভ করিয়াছিল। ফ্লোরিডাতে ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিকরা আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে, কানাডার উপকূলও সাহসী নাবিকদের কাছে আর অজ্ঞাত ছিল না। ফ্লোরিডার সেণ্ট অগাস্টাইন এবং নিউ মেক্সিকোর সাণ্টা ফে, এই দুইটি শহরই জেমস্‌টাউন কিংবা প্লিমাউথ অপেক্ষা প্রাচীন। তবুও ঘটনাক্রমে অতলান্তিক সমুদ্র-তীরের এই দুইটি শহরেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের রোমাঞ্চকর অভিযান সুরু হয়।

ইংলণ্ডের অন্যান্য ঔপনিবেশিকরা ইতিপূর্বে এই দেশে অবতরণ করিবার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছিল। রোনোক-এ র‍্যালের উপনিবেশ অরণ্য গ্রাস করিয়া লইয়াছে, তাহার কোন কিছুরই চিহ্ন আজ নাই, কেবলমাত্র বৃক্ষগাত্রে

খোদিত 'ক্রোটান' নাম ও একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী ছাড়া। ১৬০৭ সালের ২৪শে মে, জেমস্ নদীর নিম্নভূভাগবর্তী উপদ্বীপে তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি-জাহাজ আসিয়া ভিড়িল, লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নহে, সেই মাটিতে মানুষের বীজ বপন করিবার জন্য।

তাহারা কীরূপ মানুষ ছিল? কেনই বা তাহারা আসিয়াছিল? প্রাচীন জগৎ হইতে এই নূতন পৃথিবীতে তাহারা কীরূপ আইনকানুন, আচার ব্যবহার বহন করিয়া আনিয়াছিল?

তাহারা ছিল দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। তাহারা আসিয়াছিল স্বর্ণসন্ধানে, দ্রুতলাভের আশায়, যেমন বহুদেশেই বহু মানুষ যাইয়া থাকে। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ভার্জিনিয়া কোম্পানী, তাহাদের প্রেরণ করিয়াছিল কিছু অর্থলাভের আশায়। এ কাহিনী সত্য।

তাহারা অভিযাত্রীই ছিল কিন্তু সামরিক আইনানুযায়ী সামরিক অভিযানে তাহারা প্রেরিত হয় নাই। উপনিবেশের সন্ধানেই তাহারা প্রেরিত হইয়াছিল, এই দেশে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী এবং গির্জা তৈয়ার করিতে এবং এই দেশে ইংলণ্ডের লোকেরা বসবাস করিতে পারিবে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহারা ক্রীতদাস ছিল না। তাহারা ছিল স্বাধীন নাগরিক। এ সত্যটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

তাহাদের সঙ্গে যে রাজকীয় দলিল এবং উপদেশাবলী ছিল তাহা পাওয়া গিয়াছে। ঐ দলিলপত্রে দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে।

প্রথমতঃ, যদিও তাহারা পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তে (তখন আমেরিকা সম্বন্ধে জনসাধারণের এই ধারণাই ছিল) যাত্রা করিয়াছিল তথাপি 'ইংরেজ হিসাবে তাহাদের অধিকার' রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, পৃথিবীর সেই সর্বশেষ প্রান্তীয় দেশেও। ইংলণ্ডের রাজার আদেশানুযায়ী তাহারা 'আমাদের অন্যান্য ডোমিনিয়নের মতোই আমাদের দেশবাসী ও ইংলণ্ডের নাগরিক-

রূপে সকল প্রকার স্বাধীনতা, ভোটাধিকার এবং আইননির্দেশিত সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং তাহা ভোগ করিবে।' অর্থাৎ যে লোক জেম্‌স্‌টাউনে গিয়াছিল সে ইংলণ্ডে থাকাকালীন যে-অধিকার ভোগ করিত সেদেশেও সেই অধিকার লাভ করিবে। তাহার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার কিংবা অত্যাচার করা চলিবে না। সে আইনের সাহায্য ভিক্ষা করিতে পারিবে। ইংলণ্ডের অধিবাসী অন্যান্য ইংরেজের মতোই তাহার সকল অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভার্জিনিয়ার এই অভিযাত্রীদের শাসনব্যবস্থার জন্য ভার্জিনিয়ায় একজন প্রেসিডেণ্ট এবং তাঁহার পরামর্শদাতা একটি কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে — একনায়কত্ব চলিবে না।

এই আদেশ পাইয়া একশত পাঁচ জন মানুষ জেমস্‌টাউনে অবতরণ করিল। তাহাদের এই কাহিনী সাহসিকতা, দুঃখবরণ এবং কষ্টসহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল। ইংলণ্ডের এই তাজা মানুষগুলি এই দেশে আসিয়াছিল; সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দেশ। আজ আমাদের কাছে চাঁদের পর্বতমালা এবং সেখানকার আগ্নেয়গিরির গুহামুখ যেমন আজব মনে হয়, তাহাদের কাছে এই দেশও তখন তেমনি আজবই ছিল। তাহাদের কাছে প্রত্যেকটি জিনিষই ছিল নূতন এবং আশ্চর্য — পশু, পাখি, ফুল, রেড ইণ্ডিয়ান, গ্রীষ্মের খরদাহন এমন কি নদীর জলের স্বাদও তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন লাগিত। শিশুদের মত তাহারা প্রথমে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিত। শিশুদের মতই তাহারা বাড়ীর জন্য আকুল হইয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে জ্বরে, অনেকে অনশনে, অনেকে রেড-ইণ্ডিয়ানের তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। রেড-ইণ্ডিয়ানরা কখনও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিত, কখনও বা বন্ধুর মত ব্যবহার করিত। ঔপনিবেশিকরা তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিত না। একবার, তাহাদের মধ্যে যে কয়জন জীবিত ছিল, তাহারা জেমস্‌টাউন পরিত্যাগ করিয়া নদী দিয়া নৌকায় পলায়ন করিল। নদীর মোহানায়

তাহারা ইংলণ্ডের সাহায্যকারী জাহাজের দেখা পাইল। সেই জাহাজে করিয়া তাহারা পুনরায় জেমস্‌টাউনে ফিরিয়া আসিল, নূতন করিয়া জীবনযাত্রা সুরু করিতে। ইহা অত্যন্ত সাহসের কাজ। কিন্তু তাহারা ফিরিয়া গেল।

তাহাদের নাম স্মিথ, পার্সি, ব্রাউন, এ্যালকক্‌, মিডউইণ্টার, সার্জেণ্ট ও মার্টিন। সমুদ্রের উপর দিয়া যে-বীজ আমেরিকায় আসিল তাহা ইহারাই। অনেকে মারা গেল, অল্প কয়েকজন বাঁচিল এবং উন্নতিলাভও করিল। তাহারা স্বর্ণের সন্ধান লাভ করিতে পারে নাই, সহজে অর্থার্জনও তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু দীর্ঘ বারো বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তাহারা একটি উপনিবেশ স্থাপন করিল। নারীরাও আসিল। শহরে নূতন শিশুও জন্ম-গ্রহণ করিল।

১৬১৯ সালের ৩০শে জুলাই। জেমস্‌টাউনের কাঠের গীর্জায় ভার্জিনিয়ার প্রথম পরিষদের অধিবেশন হইল। একজন গভর্ণর এবং তাঁহার পারিষদবর্গ আসিলেন, উপনিবেশের এগারোটি বিভিন্ন সংস্থার বাইশ জন প্রতিনিধিও আসিলেন। তাঁহারা সমবেতভাবে সেই জুলাইয়ের গ্রীষ্মের দিনে কাজ করিয়া উপনিবেশের জন্য বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করিলেন। যদিও উল্লেখযোগ্য কোন আইন তাঁহারা পাশ করেন নাই, কিন্তু আইনগুলি তাঁহাদের পক্ষে ছিল প্রয়োজনীয়। উপনিবেশে গোজাতীয় পশুর অভাব ছিল, তাই আইন করা হইল গভর্ণরের অনুমোদন ব্যতীত কেহ গরু জবাই করিতে পারিবে না। কেহ প্রতিবেশীর নৌকা কিংবা রেড-ইণ্ডিয়ানের 'ছিপ' চুরি করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। পাদ্রীদিগকে প্রতি বৎসর বিবাহ, সমাধি ও ধর্মাভিষেকক্রিয়ার একটি বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। এই ধরণের সব আইন প্রণয়ন করা হইল। গভর্ণর ও তাঁহার পারিষদবর্গ ছাড়াও বাইশজন বেসরকারী প্রতিনিধি এই আইন প্রণয়নে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজেদের সমাজজীবন

পরিচালনা করিবার জন্য নিজেরাই সমবেতভাবে বিতর্ক করিয়া এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহাকে স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না। কিন্তু নূতন একটি শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন তখন হইয়াছিল। যাহারা অরণ্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়াছিল, তাহারা মনে করিয়াছিল নিজেদের এই শাসনব্যবস্থায় কথা বলিবার অধিকারও তাহাদের ছিল। বৃটিশ সরকারও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়াই এই অধিকার মানিয়া লইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই গভর্ণর ও আইন-প্রণেতাদের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসংবাদ ও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

তবুও শেষোক্তরাই থাকিয়া গেলেন উপনিবেশের স্বার্থে কথা বলিবার জন্য। আপনারা তাঁহাদের কথা পরে আরও শুনিতে পাইবেন। ক্রমে স্বাধীনতার বীজ সেই সমৃদ্ধিশালী মাটিতে, তামাকের ক্ষেতের সারির মাঝখানে ভার্জিনিয়ার উত্তপ্ত আকাশের তলায় শিকড় বিস্তার করিল।

ইতিমধ্যে অন্য কিছু কিছু ঘটনাও ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে জন পোরি এখানে আসিয়া ভার্জিনিয়া সম্পর্কে তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন :

'আমাদের গোরক্ষক রবিবার দিন চমৎকার সিল্কের পোষাক পরিয়া বেড়াইতে যায়। সঙ্গে স্ত্রী, ক্রয়ডনের কয়লাখনির মেয়ে, তার মাথায় বিভারের টুপিতে সুন্দর মুক্তার কাজ করা।'

ইহাই অন্য ঘটনা।

এই নূতন পৃথিবী কোনদিনই বিচার করিয়া দেখে নাই এই দেশে আসিবার পূর্বে লোকটি সম্ভ্রান্ত নাইট ছিল কিংবা গোরক্ষক ছিল। যদি সে এখানে আসিয়া ভালভাবে চলিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহার স্ত্রী সিল্কের পোষাক পরিতে পারিত। কেহই তাহা অসঙ্গত মনে করিত না। ইহাও মার্কিণ জীবনাদর্শেরই একটি দিক — যে, প্রত্যেক মানুষই জগতে উন্নতি

করিবার সুযোগ লাভ করিবে, কোন মানুষই তাহার বিত্তবান কিংবা খেতাবওয়ালা অথবা ক্ষমতাশালী পিতৃপরিচয়ে অন্যের অপেক্ষা বেশী সুযোগ লাভ করিতে পারিবে না।

এইবার আমরা উত্তর দিকে একবার যাই। আরও হাজার মাইল উত্তরে, আরও রুক্ষ এবং শীতপ্রধান এক সমুদ্রতীর, শীতকালে নিউ ইংলণ্ডের সমুদ্রতীর।

১৬২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর। 'মেফ্লাওয়ার' জাহাজযোগে তীর্থযাত্রীরা এইখানে আসিয়া নোঙ্গর করিয়াছিলেন।

এই তীর্থযাত্রীরা কে, কেনই বা তাঁহারা আমেরিকায় আসিয়াছিলেন? তাঁহারাও কি দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, দেশজয়েচ্ছু কিংবা স্বর্ণসন্ধানী ছিলেন?

না, তাঁহারা ইহার কোনটিই ছিলেন না। মেফ্লাওয়ারের যাত্রীদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই জমি কিংবা কৃষিকার্যের প্রত্যাশা লইয়া এই দেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই আসিয়াছিলেন অন্য কারণে। তাঁহারা আসিয়াছিলেন স্বাধীনভাবে ভগবানের আরাধনা করিবার জন্য। সহজ ও আন্তরিক সেই মত, কিন্তু তৎকালীন ইংলণ্ডের চার্চের মতের সঙ্গে তাহার মিল ছিল না।

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের লোক। তাঁহারা সঙ্গে করিয়া স্ত্রী-পুত্রদেরও লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই নড়বড়ে ক্ষুদ্র জাহাজে চৌষট্টি দিনের সমুদ্রযাত্রায়। সমুদ্রপথে একটি শিশুর জন্ম হয়, তীরে ভিড়িবার পরই আরও দুইটি নবজাতক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। এই দলটিতেও কিঞ্চিদধিক একশত জন লোক ছিলেন। এই অভিযানেও একটি বৃটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অর্থব্যয় করিয়াছিল। কিন্তু এই অভিযানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল এই শান্তপ্রকৃতির, পারিবারিক মানুষদের দলটি; যাঁহারা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানাদিকে পৃথিবীর প্রান্তসীমার এই দেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহারা এমন পাগলামি করিতে গিয়াছিলেন কেন? পৃথিবীতে এই সুযোগটিই বা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? কেহ তাঁহাদিগকে ইহা করিবার জন্য নির্দেশ দেয় নাই, কোন প্রলোভনও দেখায় নাই। তাঁহারা নিজেদের ঘরবাড়ী উচ্ছেদ করিয়া, সমস্ত পরিচয়, শৈশব-স্মৃতি হইতে গৃহ-সামগ্রী পর্যন্ত সব-কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া এই বিপদ ও দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কারণ এগুলি ভবিষ্যতের নীড়ে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সহজ ছিল না — অথচ বিস্মৃত হওয়াও সম্ভব নয়।

তাঁহারা নিজেদের মতানুযায়ী ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চাহিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস ছিল তাঁহাদের দৃঢ়।

বহু বৎসর পূর্বে কতকগুলি কৃষক, তাহাদের ভৃত্য, একজন পোস্টমাস্টার, একটি ধর্মযাজক এবং একজন অধ্যয়নশীল ছাত্র ইংলণ্ডের উত্তর প্রান্তে তাঁহাদের দীর্ঘ যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের চার্চ এবং কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে যে উপায়ে ঈশ্বরোপাসনা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার বিরোধিতা করিয়া তাঁহারা বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা হল্যাণ্ডে চলিয়া গিয়া সেখানে নির্বিঘ্নে নির্বিবাদ শান্ত জীবন যাপন করিতেছিলেন, কারণ তাঁহারা পরিশ্রমী ও সৎ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা নিজেদের মনের মত একটি দেশের সন্ধান করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল বহু চেষ্টার পর তাঁহারা মহাসমুদ্রের অপরপ্রান্তে এমনি একটি দেশের সন্ধান লাভ করিলেন। দেশটির দিকে চাহিয়া তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এই নূতন দেশে তাঁহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিবে কে? কীরূপে তাঁহারা এই কার্য-পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এই তীর্থযাত্রীরা কাহারও ভৃত্য, ক্রীতদাস কিংবা ইংলণ্ডে তাঁহাদের বিত্তবান বন্ধুদের ভাড়াটে লোক ছিলেন না। তাঁহারা একটি সমপ্রচেষ্টার অংশীদার ছিলেন মাত্র। ইংলণ্ডের বিত্তশালী ব্যক্তিরা দশ পাউণ্ড করিয়া শেয়ার

ক্রয় করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যাঁহাদের অর্থ ছিল না, তাঁহারা এই সর্তে সমুদ্র পাড়ি দিয়াছিলেন যে, উপনিবেশ গঠনে তাঁহারা সহায়তা করিবেন। সাত বৎসর পরে ইহার মুলধন ও লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হইবে। যদি এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে কাজ করে তাহা হইলে প্রত্যেক অংশীদারই নিজেদের প্রাপ্য লাভ করিবেন, বিত্তশালী লোকেরা পাইবেন একটি লভ্যাংশ এবং তীর্থযাত্রীরা প্রত্যেকেই পাইবেন গৃহ ও আশ্রয়।

কিন্তু আমেরিকায় পদার্পণ করিয়া তীর্থযাত্রীরা নিজেরাই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে মনস্থ করিলেন। সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেন। লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারিবে কিন্তু কোন নির্দেশ দিবার ক্ষমতা তাহাদের দেওয়া হয় নাই। তাহারা লভ্যাংশ সম্পর্কে খবর জানিতে চাহিতে পারিত, সাহায্য দিতে পারিত এবং লোক প্রেরণ করিতে পারিত। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর তাহার শাসনকার্য সম্পর্কে কোন কিছু আদেশ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কিছু প্রয়োজন ছিল। তীর্থযাত্রীরা ছিলেন ইংরেজ, সমুদ্রযাত্রী ইংরেজ, অতএব তাঁহাদের স্থাপিত উপনিবেশ ইংরেজ-উপনিবেশই হইবে। তাই তীর্থযাত্রীরা সমুদ্রযাত্রার পূর্বে তাহাদের এই অভিযানের সরকারী সমর্থন লাভের জন্য ইংলণ্ডের রাজা জেমসের নিকট হইতে একটা সনদ কিংবা দলিল আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজা তেমন কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না, তাঁহাদিগকে ইহা ছাড়াই কাজ করিতে হইল। রাজা জেমস্ জানাইলেন যে, তীর্থযাত্রীরা যদি ভাল ব্যবহার করেন এবং কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। তিনি তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু রাজকীয় আশীর্বাদ দিতেও রাজী ছিলেন না।

অবশেষে তীর্থযাত্রীরা তাঁহাদের যাত্রা সুরু করিলেন। সঙ্গে লইলেন বসতি স্থাপনের এক হুকুমনামা, রাজার নিকট হইতে নয়, ভার্জিনিয়া কোম্পানীর

নিকট হইতে। যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা ভার্জিনিয়ায় থাকিবেন ততদিন এই অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কিন্তু পূর্ব ব্যবস্থা মত তাঁহারা ভার্জিনিয়ায় বসতি স্থাপন করিলেন না। তাঁহারা ঘর বাঁধিলেন নিউ ইংলণ্ডে। ঐতিহাসিকরা এই মত পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার একটি সরল ব্যাখ্যা আছে। চৌষট্টি দিন ধরিয়া তাঁহারা একখানি যাত্রীবহুল জাহাজে ছিলেন। তাহার পর তাঁহারা মাটি দেখিতে পাইলেন। এই মাটি হয়তো স্বর্গরাজ্য নয়, হয়তো ভার্জিনিয়ার মতো গরম এবং উর্বর জমিও এখানে নাই, তবু ইহা তীরভূমি। স্থানটি ছিল অরণ্যাকীর্ণ, হিংস্রদের বসতি, কিন্তু ইহা যে কঠিন মাটি সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা ইহার গন্ধ পাইতেছিলেন, স্পর্শ করিতে ও তাহার উপর পদচারণা করিতেছিলেন। তাই ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, প্রথম যে জায়গাটি তাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া অন্য দেশ বাহির করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের হইল না।

নিউ ইংলণ্ডে বসতি স্থাপনের ফলে ভার্জিনিয়া কোম্পানীর সেই হুকুমনামার কোন মূল্য রহিল না। নিউ ইংলণ্ডের উপর ভার্জিনিয়া কোম্পানীর কোন অধিকার ছিল না। মেফ্লাওয়ারে তীর্থযাত্রী ব্যতীত যাহারা ছিল, তাহারা এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, এইখানে তাহারা সরকারের সীমার বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। তাই, তীর্থযাত্রী ও তাঁহাদের বন্ধুরা, ঈশ্বরের নামে মেফ্লাওয়ারের একটা কেবিনে মিলিত হইয়া একটি স্মারকপত্র প্রস্তুত করিলেন। ইহা 'মেফ্লাওয়ার স্মারকপত্র' নামে পরিচিত। ঘোষণাটিতে ছিল :

"ঈশ্বরের নামে শান্তি হউক। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা, প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংলণ্ডের নৃপতি, ঈশ্বরেচ্ছায় ফ্রান্স ও আয়ার্লণ্ডের শাসক, ধর্মরক্ষাকারী জেমস্-এর অনুগত প্রজারূপে ঈশ্বরের মহিমায়, খৃষ্টধর্মের প্রচার এবং আমাদের স্বদেশ ও নৃপতির সম্মানের জন্য এই সমুদ্রযাত্রা করিয়া ভার্জিনিয়ার

উত্তরপ্রান্তে এই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি; আজ আমরা এই ঘোষণা দ্বারা, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যে, পরস্পরের ও ভগবানের সম্মুখে মিলিত হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং উল্লিখিত আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় ও সম্মতিক্রমে একটি নাগরিক-শাসন-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলাম। এতদ্বারা আমরা সময়ে সময়ে উপনিবেশের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য এইরূপ ন্যায়-বিচারের আইন, জরুরী আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং আইন-প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিব। এইরূপ আইনের প্রতি আমরা সকলে যথোচিত আনুগত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিব। সাক্ষী হিসাবে আমরা ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বরে কেপ কড-এ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আয়ার্লণ্ডের অষ্টাদশ এবং স্কটল্যাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশৎ নৃপতি জেমসের রাজত্বকালে নিজেদের নাম সহি করিলাম।"

একচল্লিশ জন লোক এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং সর্বসম্মতি-ক্রমে জন কার্ভারকে উপনিবেশের প্রথম গভর্ণর নির্বাচনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর, তাঁহারা দেশটি আবিষ্কার করিয়া বাসযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

এই ঘোষণাপত্রটির সার্থকতা কি ছিল, যাহাতে তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন? ইহা কি স্বাধীনতার ঘোষণা? না, কারণ তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজার অনুগত প্রজা।

ইহাতে কি সর্বসাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও সাম্য ঘোষিত হইয়াছিল? না, তখনও তাহার অনেক দেরী ছিল।

কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য ঘোষিত এবং দলিলে লিখিত হইয়াছিল। মানুষেরা সেখানে মিলিত হইয়া প্রয়োজনবোধেই একটি সরকার গঠন করিয়াছিলেন, যে সরকার 'সর্বসাধারণের স্বার্থে ন্যায়সঙ্গত ও সকলের প্রতি প্রযোজ্য আইন' প্রণয়ন করিবেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও এই প্রতিজ্ঞাপত্র ও অধিবেশনের কথা স্মরণ রাখিবেন। সাধারণ

মানুষ, যাহারা তাঁত বোনে, যাহারা পশমের কাজ করে, যাহারা ছিল গৃহস্থ ঘরের মানুষ, তাহারাও সকলে একত্র মিলিত হইয়া, রাজকীয় সনদ কিংবা কোম্পানীর নির্দেশ ছাড়াই নিজেদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আইনকানুন প্রণয়ন করিতে পারিত। তাহারা ইহা করিয়াছিল, তাই পরবর্তীকালের মানুষদের মনে এই স্মৃতি জাগরিত ছিল।

জেমস্‌টাউনে প্রথম যে দল অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদের মতোই প্লিমাউথে যে-সব নরনারী বসতি করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকেও নির্জনতার মধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই জায়গাটিতে অত্যধিক গরম ছিল না, ছিল অত্যধিক শীত, কিন্তু দুঃখ কষ্ট সমানই ছিল। প্রথম শীতেই তাহাদের দলের অর্ধেক মানুষ প্রাণত্যাগ করে। আজও সেই নূতন পৃথিবীর কুয়াশা-ঘেরা মাটির নীচে তাহারা চিরনিদ্রায় শায়িত। কিন্তু সেই শক্ত সবল পুরুষেরা মারা গেলেও, কষ্টসহিষ্ণু নারীরা প্রত্যেকটি শিশুকে বাঁচাইয়া রাখিল। তারপর আসিল বসন্ত, নিউ ইংলণ্ড বসন্তে সবুজ হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল এখানেও পাখিরা মধুরস্বরে গান করে।

রেড-ইণ্ডিয়ানদের নিকট হইতে তাহারা শস্য বপন করিতে শিখিল, শিখিল কি করিয়া সেই শস্য ব্যবহার করিতে হয়। তাহারা নদীতে মাছ ধরিতেও শিখিল। তাহারা বন্যদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার উপায়ও জানিয়া লইল।

প্রথম বৎসরটা তাহাদের প্রায় অনশন অর্ধাশনেই কাটিল। কিন্তু পরে তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া তুলিল। সেই গহন অরণ্যের মধ্যেই নিজেদের মনের দৃঢ়তার দ্বারা তাহারা এমন একটি আবাসভূমি গড়িয়া তুলিল, যেখানে তাহারা নিজেদের মনের মত করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে পারিত।

আমেরিকার মাটিতে আরেকটি বীজ বপন করা হইল। জেমস্‌টাউনে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা নিজেদের সমুদ্রপারের সংরক্ষিত অধিকার

প্রতিষ্ঠা করিল, সেই নির্জনদেশে মানুষের সম-অধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রতিনিধি পরিষদও স্থাপন করিল। প্লিমাউথের মানুষেরা নিজেদের মতে ভগবানকে উপাসনা করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ভিত্তি স্থাপন করিল, যাহা পূর্ণাঙ্গ না হইলেও, পূর্বতন যে-সমাজব্যবস্থায় তাহাদের জন্ম ও জীবনযাপন, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই দুইটি দেশেই মানুষ মনুষ্যত্বের মূল্য লাভ করিল।

এই প্রথম অভিযাত্রীদলের মানুষেরা কে ছিলেন?

জন স্মিথ, জেমস্‌টাউনের অধিবাসী, সৈনিক, আবিষ্কারক, মানচিত্র-প্রণয়নকারী, গল্প-কথক, একমুখ দাড়ি, অনুসন্ধিৎসুমনা, কৌতূহলী, অক্লান্ত-কর্মী, যে কোন নূতন জিনিষ দেখিলেই আনন্দিত, কিন্তু সর্বদাই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে ভার্জিনিয়া ও নিউ ইংলণ্ডের তীরভূমির মানচিত্র অঙ্কন করিতেন।

প্লিমাউথের অধিবাসী উইলিয়ম ব্র্যাডফোর্ড পণ্ডিত ব্যক্তি, অমায়িক, কষ্টসহিষ্ণু, ভগবদ্বিশ্বাসী, উপনিবেশের ত্রিশ বৎসরাধিক কালের গভর্ণর ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চারিশত পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই দলের মধ্যে খারাপ, ভাল, বোকা এবং সরল, এমন কি খুনী লোকও ছিল— তাহারাও এই নূতন জীবনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কিছু করিয়া লইয়াছিল। কৃষক, তাঁতী, মিস্ত্রী, চাষার ছেলে, দুঃসাহসী অভিযাত্রী, বিত্তহীন ব্যক্তি সব রকমের লোকই তাহাদের দলে ছিল— ধনবানেরা নহে।

একজন প্রকৃত সম্ভ্রান্ত নাইট, স্যার রিচার্ড সল্টনস্টল আসিয়াছিলেন দ্বিতীয় দলের দেশত্যাগীদের সঙ্গে ম্যাসাচুসেট্‌স্ বে উপনিবেশে। আরও অনেক খ্যাতিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসিয়াছিলেন আরও পরে। মোটের উপর, ধনী ও অলস অকর্মারাই দেশে রহিয়া গেল। যাহারা আসিয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে, ভগবান তাহাদের জন্য গম ঝাড়িয়া দিতেন সেই

অনাবাদী জমিতে বপন করিবার জন্য। তাহারা এই সম্পর্কে কি মনে করিত, ব্র্যাডফোর্ডের কথা হইতেই তাহা জানা যায়: "ইহা ঠিক যে ভয় ছিল বিরাট কিন্তু তাহা বেপরোয়া ছিল না; বিপদ ছিল অসংখ্য, কিন্তু তাহা অজেয় ছিল না।" পরবর্তীকালে যখন আমেরিকা পশ্চিমদিকের সমতলভূমির দিকে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তখন একটি প্রবাদ বহুল প্রচলিত ছিল: "কাপুরুষেরা স্বদেশ হইতে যাত্রাই করে নাই, দুর্বলেরা পথিমধ্যেই মারা গিয়াছিল।" প্রথম দলের লোকদের সম্পর্কে একথাগুলি বাস্তবিকই প্রযোজ্য ছিল। এইরূপ হওয়ারই কথা। কারণ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, স্বাধীন মানুষের মত বাস করিবার বাসনা, দুঃসাহসের প্রেরণা, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা ব্যতীত কোন মানুষই পশ্চাতের পরিচিত জগৎ ফেলিয়া ছোট জাহাজে করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে পারে না। কিন্তু যদি মনে নিরাশার শূন্যতা ব্যতীত অন্য কিছুই না থাকে, তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। ইহাদের মধ্যে অসৎচরিত্র লোকও ছিল, সকল দেশেই এই ধরনের লোক থাকে। কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা স্বাবলম্বী হইতে শিখিল। এইরূপে নবজীবনের সূত্রপাত হইল।

বিপুল সংখ্যায় ঔপনিবেশিকদের আগমন

মৌমাছিরা যেমন ফুলের বনে আসিয়া মিলিত হয় সেই রকম ভাবেই তাহারা আসিতে আরম্ভ করিল। ১৬২০ খৃষ্টাব্দ হইতেই তাহাদের এই আগমনের সূত্রপাত, তাহার পর তাহারা আসিতেই লাগিল।

এই বিরাট পশ্চিমাভিমুখী যাত্রা শুধুমাত্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে নয়, সমগ্র ইউরোপ হইতেই আরম্ভ হইল। চুম্বকের নিকট যেমন ভাবে লোহার টুক্‌রা আকৃষ্ট হয়, তাহারাও তেমনি ভাবে এই নূতন পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট

হইল। কেহ আসিল ব্যক্তিগত ভাবে, কেহ আসিল দল বাঁধিয়া সমাজবদ্ধ ভাবে, এমন কি একই গীর্জার উপাসকমণ্ডলীরূপেও। বিশেষ কুশলী শিল্পীদেরও এখানে আনা হয়, জেমস্‌টাউনে আসিয়াছিল ইতালীয় কাঁচ নির্মাতা। কেহ কেহ শ্রমিক হিসাবেও আসিয়াছিল, ফ্লোরিডার নিউ স্মার্ণাতে বহু গ্রীক ও মিনোরকাদেশীয়দের যেমন আসিতে হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল; ওলন্দাজরা আসিয়াছিল নিউ নেদারল্যাণ্ডসে, সুইডেনবাসীরা আসিল ডেলাওয়ারে, ফরাসীরা দক্ষিণ ক্যারোলাইনায়। এইভাবে সমস্ত দক্ষিণ দেশটা পর্যায়ক্রমে ফরাসী ও স্পেনীয়দের কাছে হাত বদল হয়। স্পেনদেশীয়েরা থাকিল ফ্লোরিডা, নিউ মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্ণিয়ায়, আইরীশ, স্কচ্‌ ও জার্মানরা পেনসিলভ্যানিয়ায়, ইংরেজরা সর্বত্রই। ইহারা সকলেই নিজেদের দেশের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। যেমন, সুইডেনবাসীরা আনিয়াছিল কাঠের বাড়ী। তাহারাই সর্বপ্রথম মার্কিণ উপনিবেশের সর্বত্র কাঠের বাড়ী বা 'লগ্‌ কেবিন' তৈরী করে। ওলন্দাজেরাও অনেক জিনিস আনিয়াছিল, তাহার মধ্যে বিশিষ্ট ধর্মযাজক সেণ্ট নিকোলাস, সাণ্টা ক্লস্‌ উল্লেখযোগ্য। জার্মানরা তাহাদের ধৈর্যশীল কৃষিকার্যের উপায় আনিয়াছিল এদেশবাসীর জন্য। ফরাসীরা তাহাদের ফলের বাগানে প্রয়োগের কুশলতা লইয়া আসিয়াছিল।

বিদ্রোহীরা আসিল, যাহারা রাজার পক্ষে বা কমনওয়েলথের স্বার্থে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া এই নূতন দেশে পলায়ন করিয়াছিল। তীর্থযাত্রীদের ন্যায় অন্যান্য ধর্মোৎসাহীরাও আসিয়াছিল, যাহারা বিনা বাধায় নিজেদের মতানুযায়ী ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চাহিয়াছিল। দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষেরাও আসিয়াছিল — পৃথিবীতে যাহারা মানুষ হিসাবে বাঁচিতে চাহিয়াছিল। এমন মানুষও আসিল যাহারা একটা কিছু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল; মজুররা আসিল যাহারা কয়েক বৎসর নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে শেষে পারিশ্রমিক হিসাবে

একটা টুপি, এক জোড়া পোষাক, একটা সস্তা বন্দুক এবং একটা কিছু উন্নতির সুযোগের আশা করিত। তাহাদের মধ্যে ভবঘুরে ও অপরাধীরাও ছিল।

তখন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বিশেষ মিশ্রণ ঘটে নাই, পরবর্তীকালে যাহা হইয়াছিল। বৃটিশেরাই ছিল বেশী। কিন্তু নূতনেরা আসিতে আরম্ভ করিল, সিক্সাস্, দ্য লা নোয়, ভ্যান কোর্টল্যাণ্ড, গ্রোহান, ম্যানস্কার, হারকিমার, এইরূপ শতাধিক শ্রেণীর লোক আসিল। প্রত্যেকটি নূতন বংশই আমেরিকার সমাজ-জীবনে নিজেদের ঐতিহ্য, নিজেদের বৈচিত্র্য বহন করিয়া আনিয়াছিল।

১৭৭৬ সালের মধ্যেই অতলান্তিক সমুদ্রতীরবর্তী মেইন হইতে জর্জিয়া পর্যন্ত সহস্র মাইল বিস্তৃত ভূভাগে তেরোটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই তেরোটি উপনিবেশে বিভিন্ন জাতির প্রায় বিশ লক্ষ লোক, সকলেই বৃটিশ পতাকার তলায় বাস করিতে লাগিল।

তাহারা নদীর গতিপথ ধরিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিল। তখন পর্যন্ত তাহারা দেশের মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। দীর্ঘ প্রসারিত আপেলিশিয়ান পর্বতের প্রাচীর তাহাদিগকে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কোন কোন কষ্টসহিষ্ণু ঔপনিবেশিক সেই প্রাচীরও কোন কোন স্থানে অতিক্রম করিয়াছিল।

এই দেশটিকে তাহারা অর্জন করিয়াছিল বহু রক্ত, বহু শ্রম আর ঘর্মের বিনিময়ে, এই জন্য তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সন্ধিও করিতে হইয়াছে। অস্ত্র, কুঠার আর লাঙ্গল এই সব-কিছুর সাহায্যেই তাহারা নূতন-আশায় এই নূতন দেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

তেরোটি উপনিবেশ। বিভিন্ন জাতির, বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের লোক নিজেদের মত করিয়া এই উপনিবেশগুলির শাসনকার্য চালাইতেছিল। এই তেরোটি উপনিবেশের প্রতীকরূপেই মার্কিণ পতাকায় একটি করিয়া তারকা ও একটি

করিয়া রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাদের স্মৃতি-স্বাক্ষর রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রথম বসতি স্থাপনের তারিখগুলি নিম্নলিখিত রূপ :

ভার্জিনিয়া	:	১৬০৭
নিউইয়র্ক	:	১৬১৪
ম্যাসাচুসেটস্	:	১৬২০
নিউ হ্যাম্পশায়ার	:	১৬২৩
মেরীল্যাণ্ড	:	১৬৩৪
কনেটিকাট্	:	১৬৩৫
রোড দ্বীপ	:	১৬৩৬
ডেলাওয়ার	:	১৬৩৮
উত্তর ক্যারোলাইনা	:	১৬৫০
নিউ জার্সি	:	১৬৬৪
দক্ষিণ ক্যারোলাইনা	:	১৬৭০
পেনসিলভ্যানিয়া	:	১৬৮২
জর্জিয়া	:	১৭৩৩

ইহাদের মধ্যে ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেটসের প্রতিষ্ঠা হয় জেমস্টাউন ও প্লিমাউথে। ক্ষুদ্রতম কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্বাধীনতাপ্রিয় উপনিবেশ রোড দ্বীপের প্রতিষ্ঠা করেন রোজার উইলিয়মস্ ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই সেই দেশের অধিবাসীদিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করা হয়। পেনসিলভ্যানিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়াম পেন নামক একজন কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি এবং বহু কোয়েকার সেই উপনিবেশে বসতি স্থাপন করেন। জর্জিয়ার প্রতিষ্ঠাতা জেমস্ ওগলেথোর্প। তিনি দরিদ্র দেনাদারদের মুক্তিদানের জন্য মানবিক প্রেরণাতেই ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় ঋণের জন্য কারাভোগ ইংলণ্ডে একটা গুরুতর সমস্যা ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন এমন একটি দেশ যেখানে মানুষ নূতন ভাবে জীবনযাত্রা সুরু করিতে পারে। ওলন্দাজরা নিউইয়র্কের

প্রথম প্রতিষ্ঠা করে নিউ নেদারল্যাণ্ড উপনিবেশ হিসাবে। ইহা নিউইয়র্ক প্রদেশে পরিবর্তিত হয় ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে। মেরীল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা হয় লর্ড বাল্টিমোর নামে একজন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা। বহু ক্যাথলিক ধর্মযাজক ও সাধারণ মানুষ প্রথম বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এখানে আসে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বহু বিচিত্রের সমাবেশেই এ দেশের প্রথম গোড়াপত্তন; সমস্ত উপনিবেশগুলির জন্য কোন একটা নির্দিষ্ট নীতি ছিল না।

১৭৬৫ সালে কেহ এই ঔপনিবেশিকদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত: 'আমি ম্যাসাচুসেটসের লোক, আমি ভার্জিনিয়াবাসী, আমি জর্জিয়ার অধিবাসী।' এমনি ভাবে তাহারা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করিত। তাহারা বৃটিশ পতাকা উড়াইত, ভোজের সময় ইংলণ্ডের রাজার স্বাস্থ্যপান করিত। কিন্তু তাহারা ইংলণ্ডের মাটিতে বাস করিতেছিল না, এমন অনেকে ছিল যাহারা কোনদিন ইংলণ্ডে যায় নাই, দেখেও নাই। 'মার্কিণী' শব্দটা তখন হইতেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে যে অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে তখনও তাহা প্রযোজ্য হইত না। তাহারা তখন পর্যন্ত একটা বৃহৎ জাতির অংশরূপে পরিচিত ছিল না। তাহাদের পরিচয় ছিল, ম্যাসাচুসেটসের লোক, কনেটিকাটের লোক, রোড দ্বীপের অধিবাসীরূপে। তাহা ছাড়া ভার্জিনিয়ার তামাক-চাষী ধনী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সঙ্গে, নিউ ইংলণ্ডের কৃষক কিম্বা অরণ্য-নির্জনতায় কাঠের কোঠাবাড়ি নির্মাতাদের জীবনযাত্রার কোন মিল ছিল না।

কিন্তু এই বহুবিচিত্র ব্যক্তিদের মধ্যে কোন একটা সাধারণ যোগসূত্র ছিল। তাহা না থাকিলে, তাহারা এইরূপ একটি মহৎ জাতির সৃষ্টি করিতে পারিত না।

জেমস্‌টাউনের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই ন্যূনাধিক একশত ষাট বৎসর ধরিয়া তাহারা কী করিয়াছিল, কীই বা উন্নতিবিধান করিয়াছিল?

তাহারা নগর ও শহর গড়িয়া তুলিয়াছিল—ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, নিউইয়র্ক, উলিয়ামসবার্গ, চার্লসটন প্রভৃতি নগর তাহাদেরই সৃষ্টি।

তাহারা রেড-ইণ্ডিয়ানদের হটাইয়া দিয়া নিজেদের বাসভূমি সেখানে করিয়া লইয়াছিল। তাহারা অরণ্য উৎপাটিত করিয়া সে অঞ্চলকে কৃষিযোগ্য শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সাহসী নাবিক, চতুর ব্যবসায়ী এবং কষ্টসহিষ্ণু সমুদ্রযাত্রী গড়িয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে ধনী ও আয়েশকামী লোকও ছিল, যাহারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়া নিজেদের সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করিত। কোন কোন ব্যক্তিরা আবার বিরাট জমির মালিক হইয়া জমিদারী ঐশ্বর্যে বসবাস করিত। তাহাদের অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, গীর্জা, জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান সবই ছিল। বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বাণিজ্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তাঁতী, ধোলাইকর, মুদ্রক, স্বর্ণকার এবং নানা ধরণের শিল্পী ছিল, যদিও চাষবাস, তামাকের চাষ ও মাছ ধরাই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। তাহাদের প্রচেষ্টায় শিল্পও গড়িয়া উঠিল। বস্তুতঃপক্ষে এই তেরোটি উপনিবেশে ১৭৭৫ সালেই যতগুলি লৌহ কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইংলণ্ড ও ওয়েলসেও তত ছিল না, যদিও অধিকাংশই ছিল ক্ষুদ্রায়তন। ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক কিংবা বোস্টন শহরে গেলে আপনি নগরজীবনের সমস্ত রকম বৈচিত্র্য, থিয়েটার, সংবাদপত্র, কনসার্ট, নাচগান ও মদের আড্ডা দেখিতে পাইতেন।

কিন্তু শুধু এই জন্যই ইউরোপীয় পর্যটকরা মার্কিণ-জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী হয় নাই। ফিলাডেলফিয়াকে প্যারীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না; নিউইয়র্ক লণ্ডনের মতো শহর ছিল না। কিন্তু এই ছোট শহরগুলির সুখী ছোট সমাজের লোকেরা অন্য যে-কোনও সুখী সমাজের লোকদের মতই ছিল এবং তাহাদের রুচি, বেশভূষার আধুনিকত্ব, নাচের সময়ে সঠিক সুর ও তালের জন্য সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে ইউরোপীয় সমাজের দিকেই তাকাইয়া থাকিত। ইউরোপীয় পর্যটকেরা ইহাদের চেয়ে সুন্দর শহর, ইহাদের চেয়ে বিত্তবান ব্যবসায়ীসমাজ দেখিতে অভ্যস্ত। আমেরিকার কৃষিব্যবস্থা অপেক্ষা উন্নততর কৃষিব্যবস্থা অন্যদেশে তাহারা দেখিয়াছিল, কারণ তখন পর্যন্ত আমেরিকায়

কৃষিকার্য উন্নত পর্যায়ে গিয়া পৌছায় নাই। সেই দেশে এত বেশী জমি ছিল যে, মানুষ ইচ্ছা করিলেই এক জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃষিকাজ শেষ করিয়া অন্য জায়গায় গিয়া আবার চাষাবাদ করিতে পারিত।

কেবল এই জিনিসগুলি দেখিয়াই ইউরোপীয় পর্যটকেরা মুগ্ধ হয় নাই। এই ধরণের জিনিস তাহারা পূর্বেও দেখিয়াছে। যাহা তাহাদের কাছে অভিনব মনে হইল, তাহা হইতেছে এই বিরাট, দূরপ্রসারিত দেশ, সুন্দর, পরমাশ্চর্য, যে দেশের সভ্যতা তখনও গ্রাম্য-গন্ধী, যে দেশের লোকবসতির গা ঘেঁষিয়া বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো প্রকৃতি তাহার আরণ্যক প্রতিবন্ধক লইয়া দণ্ডায়মান, যাহার সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিয়া মানুষকে বাঁচিতে হইত। এই দেশের মানুষদের মনোবল, তাহাদের স্বভাব, তাহাদের জীবনযাত্রাই পর্যটকদের আকৃষ্ট করিয়াছিল।

হেক্‌টর সেণ্ট জন দ্য ক্রেভেকুব্‌ নামীয় একজন সম্ভ্রান্ত ফরাসী ১৭৫৯ সালে নিউইয়র্ক উপনিবেশে আসিয়া এইখানে কুড়ি বৎসর বাস করেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"এইখানে আমরা কোন রাজার জন্য শ্রম করি না, অনশনে থাকি না কিংবা রক্তদানও করি না — এখানে মানুষ স্বাধীন, তার প্রাপ্য স্বাধীনতার সে অধিকারী……তাহলে আমেরিকার এই নতুন সমাজের মানুষের পরিচয় কি ? সে হয় ইউরোপীয়, নয় তো ইউরোপীয়ের বংশধর, তাই এদেশে বিচিত্র রক্তের সংমিশ্রণ, যা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। আমি এমন একটি পরিবারের কথা জানি যার পিতামহ ছিলেন ইংরেজ, পিতামহীটি ছিলেন ওলন্দাজ, যার ছেলে বিয়ে করেছিল একজন ফরাসী মহিলাকে এবং এখনকার চারটি ছেলে চারটি বিভিন্ন জাতের মেয়ে বিয়ে করেছে। এখানে সকল জাতির ব্যক্তি সংমিশ্রিত হয়ে একটা নতুন জাতির ছাঁচে তৈরী হচ্ছে, যাদের পরিশ্রম এবং বংশধরগণ একদিন পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন সাধন

করবে।……আমেরিকানরা নতুন মানুষ, তাদের আদর্শও নতুন, তাই তারা নতুন নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারা অনুসারেই কাজ করে থাকে …।"

কথাগুলি বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক, শুনিলে উৎসাহিত হইবার কথা। কিন্তু এই নূতন আদর্শগুলি কি? মানুষের মধ্যে এই নূতন পরীক্ষার স্বরূপই বা কি? ইউরোপীয়ান পর্যটকরা অন্ততঃ এই বিষয়ে একমত ছিল যে নূতন পরীক্ষা সুরু হইয়াছে, এবং তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো।

প্রথমতঃ, উপনিবেশের অধিবাসীরা ইহা স্থির করে যে মানুষের ধর্ম তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি এই কথা বলিতে পারেন না যে কোয়েকারদের আমেরিকায় আসা উচিত হয় নাই। তাহারা পেনসিলভ্যানিয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ক্যাথলিকরাও মেরীল্যাণ্ডে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু আপনি তো এই কথা বলিতে পারেন না যে তাহাদের এই দেশে আসা উচিত হয় নাই। ইহুদীরাও ফিলাডেলফিয়ায় নিউপোর্টে ও অন্যান্য জায়গায় আসিয়া নিজেদের উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহুদী-দিগের এই বসতিস্থাপন অযৌক্তিক এই কথাও স্বীকার করা চলে না। তেমনি নিউ ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্টদের বসতি ছিল, তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটেনা যে আমেরিকায় আসা তাহাদের উচিত হয় নাই।

ইহা সত্য যে ক্যাথলিকরা কোন কোন উপনিবেশে কিছু কিছু বাধা-নিষেধের মধ্যে বাস করিত। কিন্তু তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য তাহাদিগকে অন্যায় সহ্য করিতে হয় নাই। ইহাও সত্য যে নিউ ইংলণ্ডের গোড়াপত্তনের সময় সেখানকার পিউরিটানরা একটা সার্বভৌম গীর্জা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল, এবং যাহারা তাহাদের মতে সম্মতি দেয় নাই, তাহাদিগকে ধর্মচ্যুত করা হয়। কিন্তু সেই গীর্জার অনুশাসন কাজ করিতে পারিল না। এই বিরাট দেশের আয়তনই তাহাদের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। একটি শহর হইতে কোন ব্যক্তিকে বিতাড়িত করা যায়, হয়তো সেজন্য তাহার অসুবিধাও হইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই এক শত কি দুই শত মাইল

দূরে গিয়া অন্য কোন জায়গায় বসতি স্থাপন করিবে এবং সেখানে সে নিজের উপায়ে ভগবানের উপাসনা করিতে পারিবে। রোড দ্বীপের উপনিবেশ-স্রষ্টা রোজার উইলিয়ামসেরও এই অসুবিধা হইয়াছিল। নিজের ধর্মবিশ্বাসের জন্য তিনি ম্যাসাচুসেটস্ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন করিলেন যেখানে সর্বশ্রেণীর লোক নিজেদের ধর্মবিশ্বাস লইয়া পারস্পরিক সম্প্রীতিতে বসবাস করিতে পারিত। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সনদ যখন তিনি লাভ করিলেন, তখন ম্যাসাচুসেটসের লোকেরা তাঁহাকে আর কিছু করিতে পারিল না। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিত। এই বিরাট দেশে সর্বশ্রেণীর ও সর্বধর্মের লোকের স্থান ছিল এবং ইহার ফলে তাহারা সকলেই প্রতিবেশীর ন্যায় সৌহার্দ্যে উন্নতিলাভ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের মতই মানুষের পিতৃপরিচয় এবং আদি বাসস্থানও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি সমস্তগুলি উপনিবেশ একটি জাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে ইতিহাস অন্যরকম হইত। কিন্তু ঐভাবে তাহা গড়িয়া উঠে নাই। এই দেশের মাটি মানুষের পদধ্বনির প্রতীক্ষায় আকুল হইয়াছিল, তাই সকল দেশ হইতেই মানুষ আসিতে লাগিল। দেশের সীমান্ত মানুষ চাহিতেছিল, ক্ষুধার্তের মতোই সে-চাওয়া। তাই সেই মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহার কোন নেতৃত্বশক্তি আছে কিনা সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নই সেদিন উঠে নাই। উপনিবেশে সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই ছিল অবারিত দ্বার। কাহারও চোখ নীলাভ, কেউ কৃষ্ণাক্ষ, কাহারও চুল সোনালী, কাহারও হল্‌দে, কেহ হামবুর্গের ইহুদী, কেহ বা কর্কবাসী আইরীশ, কেহ কাজ করিত ওয়েলসের খনিতে কিংবা কেহ ছিল ব্রিস্টলের মুচি, এই প্রশ্ন তুলিয়া কাহাকেও সেইদিন প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই।

ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছিল — নিগ্রো ক্রীতদাসেরা। আমরা যথাস্থানে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিব।

তৃতীয়তঃ, ঔপনিবেশিক এই অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে বেশ

অভিজ্ঞতা ছিল। এই দেশের বিরাটত্ব এবং বিশেষত্ব এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছিল।

আগেই বলা হইয়াছে, জেমস্‌টাউন ও প্লিমাউথের প্রথম ঔপনিবেশিকরা ইংরেজ হিসাবে তাহাদের অধিকার লইয়া আসিয়াছিল। ইংলণ্ডে থাকিলে তাহারা যে অধিকার ভোগ করিত, এই দেশেও সেই অধিকারই তাহারা ভোগ করিত। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার মোটামুটি ঐতিহ্যও তাহারা বহন করিয়া আনিয়াছিল। এই শাসনব্যবস্থা একনায়কত্ব নয়, সার্বভৌম রাজ-শাসনও নয়, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হাউস অব কমন্সের অধিবেশনের সাহায্যে নিজেদের দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিত। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অনুকরণে আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশে পরিষদ গড়িয়া উঠে। বস্তুতঃপক্ষে এইগুলি ছিল পার্লামেণ্টেরই স্থানীয় ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই পরিষদগুলিতে জনপ্রতিনিধিদিগকে পার্লামেণ্টের অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে কোন সমস্যার আলোচনা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিত। কোন কোন পরিষদের ক্ষমতা ছিল বেশী, কোনটার কম। কিন্তু রাজকীয় উপনিবেশেও বিরোধী কিংবা অসহ-যোগী কোন পরিষদ্ রাজপ্রতিনিধি গভর্ণরকে খুবই মুস্কিলে ফেলিতে পারিত — এরূপ বহু গভর্ণরের দৃষ্টান্ত আছে।

নিউ ইংলণ্ডে শহরগুলিই ছিল স্থানীয় ইউনিট, এই ইউনিটের সভার অধি-বেশনের নিয়মটি ছিল খুবই প্রাচীন। এই নাগরিক সভায় শহরের নাগরিকরা আসিয়া কর্মচারী নির্বাচন এবং স্থানীয় সমস্যার আলোচনা ও তাহার সমাধান করিত। এই সব স্থানীয় সভায় প্রত্যেক নাগরিকের বলিবার অধিকার ছিল। ম্যাসাচুসেট্‌সে প্রথম দিকে নাগরিকদের এই স্বাধীনতা দেওয়া হইত না। উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা হস্তক্ষেপও করিতে পারিত না। তৎসত্ত্বেও প্রত্যেক নাগরিকের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ছিল, তাহারা 'জুরী'তে বসিতে পারিত, সেনাবাহিনীতে কাজ

গ্রহণ করিতে পারিত এবং ইচ্ছামত সাধারণ বিচারালয়ে নিজেদের অভিযোগ ও আবেদন পেশ করিতে পারিত।

ঐতিহাসিক চার্লস্, এম্, এনড্রুস্ বলেন: "১৬৫২ সালের পূর্বেই, ম্যাসাচুসেটস্ যখন নিজেকে স্বাধীন কমনওয়েলথ রূপে ঘোষণা করে, তখন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিত এবং শাসন পরিচালনা ব্যাপারে কোন না কোন অংশ গ্রহণ করিত, তাহা স্থানীয়ই হউক কিংবা কেন্দ্রীয়ই হউক।" সব উপনিবেশের এই প্রথা ছিল না। ত্রিশ বৎসরে একটি যুগ ধরিয়া, ১৬৫২ সাল হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় আমেরিকার বিপ্লবের সময় পর্যন্ত ম্যাসাচুসেট্সের লোকেরা চারটি যুগ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

তাহা ছাড়া সীমান্ত প্রদেশসমূহেও বহু লক্ষ লোক বাস করিত। এই সীমান্তের অধিবাসীদের নিকট ঔপনিবেশিক গভর্ণর ও শাসনপরিষদসমূহ ছিল বহু দূরে, ইংলণ্ডের শাসন তো আরো দূরে। তাহারা সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যে জীবন-মরণ সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিয়া নিজেরাই নিজেদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিত, কারণ তাহাদের অন্য কোন লোক ছিল না। ইংলণ্ডেশ্বর আসিয়া তাহাদের বন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবেন না, ভার্জিনিয়ার গভর্ণর তাহাদের শস্য বপন করিয়া দিতে আসিবেন না। তাহাদের আত্মনির্ভরশীল হইতে হইয়াছিল। তাই যখনই কোন নূতন নরনারীর দল আসিয়া তাহাদের প্রতিবেশী হইত, তাহাদের সহিতই সীমান্তবাসীদের মানাইয়া চলিতে হইত। পারস্পরিক সহযোগিতায় তাহারা কাঠের দুর্গ নির্মাণ করিয়া রেড-ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিত। উপাসনার জন্য তাহাদের নিজেদেরই গীর্জা তৈয়ার করিতে হইত। যদি তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চোর, খুনী কিংবা অসচ্চরিত্র থাকিত, তাহা হইলে তাহাকেও শাসনের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইত। যদি সেই কাঠের শহরের জন্য কোন মেয়রের প্রয়োজন হইত, যদি প্রয়োজন হইত কোন নেতৃ নির্বাচনের কিংবা রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করিবার জন্ম কোন সেনাপতির, তাহাকেও তাহাদের সকলকে একসঙ্গে মিলিয়াই নির্বাচন করিতে হইত। এই সবই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় করিতে হইত, যেমন করিয়া তীর্থযাত্রীরা তাহাদের প্রথম গভর্ণর নির্বাচন করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে অবশ্য রীতিমত বিচারালয়, বিচারকর্তা ও শাসনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্থানীয় লোকদের শাসনব্যাপারে মত প্রকাশের অধিকার থাকিয়া গেল, কারণ, বাহিরের লোকেরা প্রথমে আসিয়াই স্থানীয় সমস্যা ঠিকভাবে নাও বুঝিতে পারে। এমনি করিয়া দীর্ঘকাল সীমান্তের লোকেদের এই অধিকার অব্যাহত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নূতন স্কচ-আইরীশ বসতিকামীরা ১৭৩০ সালে সীমান্তবর্তী ১৫,০০০ একর জমি দখল করিয়া লয়। এই জমি আইনতঃ উপনিবেশের সম্পত্তি ছিল। তাহারা দখল করিয়াছিল এই উদ্দেশ্যে যে 'এত জন খৃষ্টান শ্রম করিতে আগ্রহশীল থাকিতে এই বিরাট জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকা ভগবানের ও প্রকৃতির নির্দেশ বিরোধী।'

উত্তর ক্যারোলাইনার সীমান্তের অধিবাসীরা উপনিবেশের সরকারের আইনকানুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ১৭৭০ সালে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ১৭৭১ সালে সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সীমান্তপ্রদেশ বন্ধুর হইলেও বিরাট সম্ভাবনাময় ছিল। সীমান্তবাসীরা বিত্তবান কিংবা উপাধিধারীদের হিসাব করিয়া চলিত না। উচ্চবংশ কিংবা নাম-প্রসিদ্ধিকে তাহারা পরোয়া করিত না। তাহারা পরিশ্রমী মানুষদেরই শ্রদ্ধা করিত, তাহারা চাহিত নিজেদের স্বাধীন মত। যাহারা তাহাদের এই অধিকারে হাত দিত, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত ছিল।

এই ভাবে ১৭৭০ সালের প্রথম দিকে এই উপনিবেশসমূহে তেরোটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র দেশে মানব সমাজের বসতি স্থাপনের নূতন পরীক্ষার সূত্রপাত। একটা সম্পূর্ণ জাতি তখনও গড়িয়া উঠে নাই। তাহারা সকলেই একই ভাষায় কথা বলিত, যদিও অন্তরে তখনও ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠে নাই। তাহাদের

মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ও পার্থক্য ছিল। ধনী ও নির্ধন উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল। কিন্তু ধনীরা খুব দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারিল না, নির্ধনেরাও খুব বেশীদিন তাহাদের দারিদ্র্য বহন করিতে রাজী ছিল না। ইউরোপের ও বৃটেনের সুদৃঢ় ও অনুশাসনবদ্ধ সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি আমেরিকার এই নূতন সমাজে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইল যেখানে যে কোন মানুষের জীবনে যে কোন পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। বোস্টনের ব্যবসায়ীর তুলনায় সীমান্তবাসীরা দরিদ্র হইতে পারে, কিন্তু তাহারাও নিজেদের অন্যান্যদের মতোই মানুষ বলিয়াই মনে করিত। নিউ-ইংলণ্ডের কৃষকেরা হয়তো অন্যান্যদের মতো মানুষের অধিকার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু তাহারা ইহা জানিত যে মানুষ হিসাবে তাহাদের অধিকার আছে এবং সেইগুলি রক্ষা করিতে তাহারা ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা হয়তো মনে করিতে পারিত না যে প্রত্যেক নাগরিকই ভোট দিবার অধিকারী, কিন্তু তাহারাও প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকারে বিশ্বাসী ছিল। বোস্টনের ব্যবসায়ীদের নিকট 'গণতন্ত্র' শব্দটা হয়তো খুবই শ্রুতিকটু লাগিত, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনকে বাধা দিতে তাহারাও বদ্ধপরিকর ছিল। নূতন বহিরাগতরা যখন এই দেশের সমাজে একবার গৃহীত হইয়া যাইত, তখন তাহারাও অন্যান্য আমেরিকানদের মতোই শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটির সমালোচনা করিবার অধিকার লাভ করিত এবং প্রয়োজন হইলে তাহা দূর করিতেও চেষ্টা করিত — তাহাদের পূর্বপরিচয়ে কিছুই আসিয়া যাইত না। ইহাই ছিল মার্কিণ জীবনের শিক্ষা — মানুষ মনুষ্যত্বের কিরূপ অধিকার লাভ করিতে পারে তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান। আমেরিকানরা এই শিক্ষায় বিশ্বাস করিত, এখনো করে।

অবশ্য তাহারা এই সমস্ত নীতিগতভাবে কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তখনও তাহারা পরীক্ষা এবং বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে বাঁচিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। আমেরিকান

হিসাবে তাহারা কি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে এবং কি করিবে তাহা জানিবার দৃষ্টান্ত তাহারা লাভ করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্ম ১৭০৬ সালে, বোস্টন শহরে। তিনি ছিলেন জোসিয়া ফ্র্যাঙ্কলিনের দশম পুত্র। জোসিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন চর্বির বাতি বিক্রয় করিতেন এবং সাবান জ্বাল দিতেন। অতি অল্প বয়সেই বুদ্ধিমান বেঞ্জামিন পড়িতে শেখে, কিন্তু দশ বৎসর বয়সের সময়েই তাহাকে স্কুল ছাড়িয়া পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করিতে হয়। বারো বৎসর বয়সে তাঁহার ভাই জেমসের অধীনে তিনি শিক্ষানবীশী মুদ্রকের কাজ আরম্ভ করেন। সতেরো বৎসর বয়সে তিনি ফিলাডেলফিয়ায় চলিয়া যান। তখনও তিনি ছাপাখানার কাজই করিতেন। তেইশ বৎসর বয়সে তিনি নিজেই সাফল্যের সহিত একটা সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে থাকেন। তাহার পর হইতে এমন কাজ খুব কমই ছিল, যাহা তিনি করেন নাই।

তিনি 'পুওর রিচার্ড'স্ আলমানাক্' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাটিতে তিনি জনসাধারণের উপযোগী বিষয়বস্তু, হাস্যরস, সাধারণ জ্ঞান, নীতিকথা ইত্যাদি পরিবেশন করিতেন। তিনি বৈদ্যুতিক তার আবিষ্কার করেন। বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেন। তিনি নিজে নিজে ফরাসী, ইতালীয়, স্প্যানীশ ও লাতিন ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি আমেরিকার মুদ্রাযন্ত্রে সর্বপ্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন। তিনি ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই উপনিবেশগুলিতে পুলিসবাহিনী ও ফায়ারব্রিগেড সংগঠন গড়িয়া তোলেন। তিনি উত্তর আমেরিকার পোস্টমাস্টার জেনারেল ছিলেন। তিনিই ইংলণ্ডে মার্কিণ উপনিবেশসমূহের বেসরকারী রাষ্ট্রদূত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ইউরোপের প্রতিটি বিদ্বজ্জনপ্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন এবং কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তিরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

দরিদ্র পিতামাতার বৃহৎ পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানরূপে তাঁহার জন্ম, তবুও বলিষ্ঠ, হাস্যরসিক, সরল ও জ্ঞানী এই ব্যক্তি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সকল সময়েই পরিচয় দিতেন, 'বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, মুদ্রক' রূপে। তাঁহার সর্বশেষের একটি চিঠিতে দৃঢ়বিশ্বাসে তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন: "পৃথিবীর সকল দেশের অধিবাসীরা স্বাধীনতা-স্পৃহায় ও মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে এতখানি উদ্বুদ্ধ হউক যে, কোন জ্ঞানী দার্শনিক যেন যে কোন দেশে পদার্পণ করিয়াই একথা বলিতে পারেন, 'এইটিই আমার দেশ'।"

ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন; এই চিন্তার বশবর্তী হইয়াই তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান— সকল দেশেই প্রতিভাবান ব্যক্তিরা জন্মান। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন আমেরিকা তাঁহার প্রতিভার সমাদর করিয়াছিল। তিনি নিজের প্রতিভায় ও কর্মনৈপুণ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। বড়লোকদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় নাই। তিনি ছিলেন আমেরিকার নিজস্ব সৃষ্টি, খাঁটি স্বদেশী। আমেরিকার তামাক, কিংবা রেড-ইণ্ডিয়ানদের শস্যের মতোই স্বদেশী বস্তু নিজের প্রতিভাগুণে তিনি আন্তর্জাতিক নাগরিক হইয়াছিলেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন তখন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, মার্কিণ জীবন ও সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা। দূরদর্শী ফ্র্যাঙ্কলিন বুঝিতে পারিলেন জাতির ভবিষ্যৎ ক্রমেই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিতেছে। তিনি ভাবিলেন, যে করিয়াই হউক উপনিবেশ-গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে, ঐক্যেই তাহাদের শক্তি, বিভক্ত হইলেই তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িবে। তিনি উপনিবেশসমূহ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর সম্পর্ক কামনা করিলেন। তিনি প্রথমটির ভিত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকে তিনি সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই। একটা বিরাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি হইল — যাহা আমেরিকার বিপ্লব নামে অভিহিত।

বিপ্লব

আমেরিকার বিপ্লবের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আজকাল মনে হয় ইহা অবশ্যম্ভাবীই ছিল ; পরক্ষণেই আবার মনে হয় এই অবশ্যম্ভাবিতারও কোন কারণ নাই।

অসন্তোষের কারণগুলি যথার্থই ছিল। তবুও ধৈর্য, দূরদর্শিতা এবং কৌশল সহকারে কাজ করিলে এই কারণ দূর করা যাইত। তবে তাহাতেই অসন্তোষ একেবারে দূর হইত কিনা, এই কথা কেহ বলিতে পারে না।

বিরোধের আসল কারণ ছিল আরও গভীর। জেমস্টাউন প্রতিষ্ঠার একশত সত্তর বৎসরের মধ্যেই এই উপনিবেশগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই তরুণের দল নিজেদের নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন রূপায়িত করিতে প্রস্তুত ছিল। যদি বৃটিশ প্রথার অংশীদাররূপেই থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই অংশীদারের দায়িত্ব ও অধিকার দাবী করিল।

কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহাদের এই তারুণ্য স্বীকার করিল না ; সম্ভাব্য অংশীদার রূপে তো নয়ই। বৃটিশ সরকারের কাছে তাহারা ছিল শিশু, স্কুলে-পড়া শিশু। অংশীদারের দায়িত্ব ও অধিকার লাভের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। শুধুমাত্র ইংরেজদেরই এই মতবাদ ছিল না। সমস্ত পৃথিবীতেই তখন এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির সমৃদ্ধির জন্যই যেন গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই মাতৃভূমির সুবিধানুযায়ী সর্বপ্রকার আইনকানুনই সেখানে প্রয়োগ করিতে হইবে।

বৃটিশ পার্লামেন্ট উপনিবেশের শাসনকার্যের জন্য আইন পাশ করিতে পারিত, কিন্তু উপনিবেশের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না পার্লামেন্টে। বৃটিশ পার্লামেন্ট উপনিবেশগুলির কর ধার্য করিত, তাহাদের এই কর দিতে হইত, নতুবা বিদ্রোহ করিতে হইত। তথাপি, একথা স্বীকার্য যে, উপনিবেশগুলির

স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত কতকগুলি অধিকার ছিল। কিন্তু এই অধিকার কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাই প্রশ্ন। কেহই তাহা বিশেষ জানিত না। ঔপনিবেশিকরা মনে করিত একরকম, বৃটিশ সরকার ব্যাখ্যা করিতেন অন্য রকম।

ইহা ছাড়া দেশ ও সময়ের ব্যবধান-সমস্যাও ছিল। সমুদ্রের এপারের ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীদের জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয়, পার্লামেণ্ট, মন্ত্রীসভা ও রাজা থাকিতেন অপর পারে। এই দুই দেশের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য কোন টেলিগ্রাম, টেলিফোন, এরোপ্লেন কিংবা স্টীমার ছিল না আমেরিকায় কোন ঘটনা ঘটিলে সেই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিতে ছয় সপ্তাহ সময়ও লাগিত। পার্লামেণ্টে সেই সম্পর্কে কোন আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তাহার খবর আমেরিকায় পৌছিতে লাগিত তিন হইতে ছয় মাস। ইংলণ্ডেশ্বর কোনদিন আমেরিকার এই উপনিবেশে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার মন্ত্রীসভারও অল্প কয়েকজনই এই দেশে আসিতেন। পার্লামেণ্ট সদস্যদের অবস্থাও তাই। অথচ যে দেশ সম্পর্কে কোন খবরই তাঁহারা রাখিতেন না, সেই দেশ সম্পর্কেই তাঁহারা আইনসভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন।

ইহার জন্য তাঁহারা দোষী ছিলেন না, কারণ অবস্থাটা এই রকমই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কারণেই, শুধুমাত্র আমেরিকার উপনিবেশসমূহই নহে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রসমূহও কালক্রমে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। সমুদ্রের অপর পারের শাসনব্যবস্থায় তাহারা অধৈর্য হইয়া গিয়াছিল। এই দূরবর্তী সরকারের জটিল শাসনপদ্ধতি সমস্ত অধিবাসীদের বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল — এই অধিবাসীরা বস্তুতঃ আর ইংরেজ, স্প্যানীশ কিংবা পর্তুগীজ ছিলনা, তাহারা ভার্জিনিয়াবাসী, ব্রাজিলবাসী, কনেকৃটিকট-বাসী কিংবা ভেনিজুয়েলান হইয়া গিয়াছিল। তাহারা নিজেদের দেশের শাসন-ব্যবস্থার অধিকতর অধিকার দাবী করিতে আরম্ভ করিল।

প্রাক্-বিপ্লবের সময় এই উপনিবেশসমূহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, কর্ষণরত জমি কিংবা আসন্ন ঝড়ের সময় সমুদ্রের দৃশ্য দেখা, অথবা প্রসববেদনাতুরা নারী কিংবা কোন শিশুকে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইবার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার মতো।

নূতন কিছু জন্মগ্রহণ করিতেছিল — কিন্তু কি তাহার পরিচয়? অগ্নিগর্ভ এই দেশে একটা সর্বধ্বংসকারী বিস্ফোরণ আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল — কিন্তু সেটা কী রকম? বিজ্ঞতম ব্যক্তিরাও তাহা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু মানুষের মনে একটা নূতন চিন্তাধারা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল।

"আমি মানুষ এবং আমেরিকাবাসী — কিন্তু এ কথার অর্থ কি? আমি স্বাধীন, আমি নিজেকে স্বাধীন বলিয়াই মনে করি — কিন্তু স্বাধীনতার আসল সার্থকতা কি? আমার কতকগুলি অধিকার আছে জানি, কিন্তু সেগুলি কি, কতদূর সেগুলি প্রযোজ্য, তাহা তো আমার জানা নাই? যে উপায়ে আমি চিন্তা করিয়া আসিয়াছি, তাহা ছাড়াও কি অন্য কোন উপায় আছে? যে অবস্থা আমি পছন্দ করি না, তাহাকে কি শুধু অভ্যাসের বশেই সহ্য করিতে হইবে? যদি তাই না হয়, তবে আমাকে কী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে?" অনেক আমেরিকাবাসীই হয়তো এই ধরণের প্রশ্ন ভাবিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া যাইত।

১৭৬৩ সালে সপ্তবর্ষ যুদ্ধের শেষের দিক হইতেই এই অসন্তোষ সুরু হয়। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড উত্তর আমেরিকায় ফ্রান্সের শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া বহু নূতন ডোমিনিয়ন অধিকার করে, এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তাহাকে মূল্য দিতে হইত। বৃটিশ সরকার মনে করিলেন, যেহেতু এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকার উপনিবেশগুলিও উপকৃত হইয়াছে, সেইজন্য তাহাদেরও এই মূল্যের কিয়দংশ বহন করা ন্যায়সঙ্গত।

ঔপনিবেশিকরা অন্যরকম চিন্তা করিল। তাহারা নিজেরাও সৈন্যবাহিনী

গড়িয়া তুলিয়াছিল, অর্থব্যয় করিয়াছিল, ফলে ঋণগ্রস্তও হইয়াছিল। ইহাও তাহারা স্বেচ্ছায় করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এই সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে নূতন কর দিতে রাজী হইল না, কারণ তাহারা ইহার অংশীদার ছিল না।

এই বিষয়ে কোন পক্ষকেই সম্পূর্ণ দোষী কিংবা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা চলে না। তাই দুই পক্ষেরই বাস্তববাদী ব্যক্তিরা, এমন কি ফ্র্যাঙ্কলিনও মনে ভাবিলেন যে মাতৃভূমি ও উপনিবেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের নূতন কোন উপায় বাহির না করিলে এই ধরণের প্রথা বেশী দিন চলিতে পারে না। অনেক কাল পর এই ধরণের একটা নূতন পরি-কল্পনা করা হয় — বৃটিশ কমনওয়েলথ অব্ নেশনস্ স্থাপন করিয়া। কিন্তু সে বহুকাল পরের কথা, ১৭৬৩ সালে পরিশ্রমী কিন্তু একগুঁয়ে রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁহার নির্বোধ ও সৌখীন পরামর্শদাতাদের পরামর্শে চালিত হইয়া অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিপ্লবের প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় স্ট্যাম্প আইনের সময়েই। উপনিবেশসমূহ হইতে অর্থ আদায়ের আশায় বৃটিশ সরকার আইন প্রণয়ন করিলেন যে আধ পেনী হইতে আরম্ভ করিয়া আশি শিলিং মূল্যের রাজস্ব স্ট্যাম্প সমস্ত উপনিবেশে সংবাদপত্র, পুস্তিকা, লাইসেন্স, বাণিজ্য-বিষয়ক 'বিল', আইনের দলিল প্রভৃতির উপর লাগাইতে হইবে। যদি এই স্ট্যাম্প কেহ ব্যবহার না করে, তাহা হইলে আইনভঙ্গের অপরাধ হইবে।

পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের কাছে ইহা ন্যায়সঙ্গতই মনে হইল, কারণ আইনে বলা হইয়াছিল যে স্ট্যাম্প বিক্রয়ের সমুদয় অর্থ উপনিবেশ-সমূহের রক্ষা ও নিরাপত্তার কার্যেই ব্যয়িত হইবে। কিন্তু ইহাতে বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হইল।

আমেরিকানরা এই স্ট্যাম্প-আইনকে সরকারের প্রয়োজনীয় ও সাধারণ ব্যবস্থারূপে স্বীকার করিতে পারিল না। তাহাদের মনে হইল ইহা দ্বারাই

বৈদেশিক এক সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত হইল, তাহাদের বিনানুমতিতেই।

তাহারা স্ট্যাম্পগুলি পোড়াইয়া ফেলিল, যাহারা ইহা বিক্রয় করিত তাহাদিগকে চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। সম্মিলিত প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। রাজার নিকট তাহারা প্রতিবাদলিপি ও আবেদনপত্র প্রেরণ করিল। তাহারা বলিল: "আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, কিন্তু ইংরেজদের মতোই আমাদের অধিকার আছে। ইংরেজদের এই অধিকার স্বীকৃত আছে যে তাহাদের বা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিনা সম্মতিতে কোনপ্রকার কর তাহাদের উপর ধার্য করা হইবে না। আমাদের নিকট হইতে এক্ষেত্রে সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই।"

স্ট্যাম্প-আইন রদ করা হইল। সমস্ত উপনিবেশসমূহে আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। কিন্তু আইন রদ হইবার ফলেও নূতন কোন ব্যবস্থা হইল না। কারণ মানুষ নূতন রকমের স্বাধীনতালাভের দাবী তুলিয়াছিল। তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল: "আমরা মৌলিক অধিকারের প্রশস্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে চাই। এই মহাদেশে নিউ ইংলণ্ড কিংবা নিউইয়র্কের অধিবাসী বলিয়া কাহারও কোন পরিচয় থাকিবে না। আমরা সকলেই আমেরিকাবাসী, মার্কিণ।"—এই কথা বলেন দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ক্রিস্টোফার গ্যাডসেন।

"আমাদের মনে করিতে হইবে — আমরা মানুষ — স্বাধীন মানুষ — স্বাধীন খৃষ্টান। সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা এই দেশে সমান অধিকার, সমান স্বার্থ ও সমান বিপদ আপদে একত্র সংঘবদ্ধ হইয়াছি। উপনিবেশবাসীরা যদি এই স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে তবে তাহাদের আর কী কাম্য থাকিতে পারে?" — বলিলেন পেনসিলভ্যানিয়ার জন ডিকিন্‌সন।

"জীবন কি এতই প্রিয়, শান্তি কি এতই মধুর যে দাসত্বের বিনিময়ে

তাহাকে ক্রয় করিতে হইবে? ইহাকে রোধ করিতে হইবে। হে ঈশ্বর, অন্যে কী চায় জানি না, কিন্তু আমার প্রার্থনা, হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।"
— ভার্জিনিয়ার প্যাট্রিক হেনরীর উক্তি।

'স্বাধীনতা' কথাটি উন্মাদনাময়। মানুষের রক্তে ইহা দোলা দেয়। প্রথমে ইহা হাওয়ায় একটা চাঞ্চল্যের মত, কিন্তু শেষে ইহা বিরাট ঘূর্ণীতে পরিণত হয়। বোস্টনের রাজপথ, পেনসিলভ্যানিয়ার কৃষিক্ষেত্র এবং ভার্জিনিয়ার উন্মুক্ত পাহাড় পর্বতের উপর দিয়া ইহা ছড়াইয়া পড়িল। "স্বাধীনতা! আমরা স্বাধীনতার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইব।" সীমান্তের প্রতিগৃহ হইতে এই শপথ শোনা গেল। রাইফেলধারী সীমান্তের অধিবাসীরা বলিল: "স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিতে হইবে না। স্বাধীনতা আমাদের আছে এবং ইহা রক্ষা করিতেও আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

গোপনে যেখানে গ্রামবাসীরা কুচকাওয়াজ শিক্ষা করে, সেখানেও এই ডাক শোনা গেল: "হে স্বাধীনতার সৈনিক, তোমরা এস, স্বাধীন মানুষের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হও।" বন্যার ন্যায়, ঝড়ের ন্যায়, দুন্দুভি-নিনাদের ন্যায় অতীত হইতে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ইহার আহ্বান শোনা যাইতেছে ও যাইবে। কিন্তু তিন সহস্র মাইল দূরে, ইংলণ্ডের পরিশ্রমী ও একগুঁয়ে নৃপতি এবং তাঁহার পরিবর্তনশীল মন্ত্রীবৃন্দ এই দুন্দুভি-নিনাদ কিংবা ঘূর্ণীবাত্যার কোন শব্দই শুনিতে পাইলেন না। তাঁহারা বিরক্ত, হতচকিত, কিছুটা বা রাগান্বিতও হইলেন। এই ঔপনিবেশিক শিশুর দলের পক্ষে স্বেচ্ছায় এই ভাবে কাজ করিতে চাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। দৃঢ়হস্তে সরকারের কর্তৃত্ব রক্ষা করিতেই হইবে। বোস্টনে যদি গোলমাল হয়, তাহা হইলে সেখানে সৈন্য প্রেরণ কর। অষ্টম হেনরীর প্রাচীন আইন পুনঃপ্রবর্তন করিয়া, বিদ্রোহীদের বিচারের জন্য ইংলণ্ডে লইয়া আসা হউক। দৃঢ়তা দেখাইতে হইবে। বার্ক ও পিটের ন্যায় ইংরেজদের আবেগপ্রবণ প্রতিবাদে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ বলিলেন: "আমেরিকানদের ভালবাসা অর্জন

করিতে হইলে তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে হইবে। কর ধার্যের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা হইবে। আমরা আর সকল কর রদ করিয়া দিব। শুধুমাত্র চা'য়ের উপর নামমাত্র একটা কর ধার্য করা হইবে। আমেরিকানরা আগের চেয়ে সস্তাদরেই চা কিনিতে পারিবে। কিন্তু আমরা যে কর ধার্য করিবার অধিকার রাখি, ইহা বুঝাইবার জন্যই তাহাদিগকে এই কর দিতে হইবে।"

তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন শিশুদের নিয়াই তাঁহারা খেলা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা মানুষ ছিল। আমেরিকার ইতিহাসে বহুবার বহু বৈদেশিক সরকার এইরূপ ভুল করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা ভাবিতেন, মার্কিণীরা কেবল অর্থের দিকটাই বড় করিয়া দেখে।

চায়ের উপর কর ধার্য করা হইল। জাহাজে করিয়া চা প্রেরণ করা হইল। চা যখন বোস্টনে পৌঁছিল, বোস্টনবাসীরা সেই চা জলে ফেলিয়া দিল। 'বোস্টন টি-পার্টি' নামে পরিচিত এই ঘটনা ঘটিল ১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। ধূসর রঙের জলে চা যেমন করিয়া ভাসিয়া গেল, তেমন করিয়াই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সমস্ত আশাও ভাসিয়া গেল।

বৃটিশ সরকার মনে করিলেন ইহার পর হটিয়া আসা চলে না। ঔপনিবেশিকরা মনে করিল তাহারাও হটিবে না।

বৃটিশ সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন। ম্যাসাচুসেট্সের সনন্দ রদ করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য জবরদস্তীমূলক আইন পাশ করিলেন। উপনিবেশসমূহ এই অত্যাচারের উত্তর দিল একটি 'কন্‌টিনেণ্টাল কংগ্রেস' আহ্বান করিয়া। ১৭৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর ক্যারোলাইনা ও জর্জিয়া ব্যতীত অন্য সকল উপনিবেশের পঁয়তাল্লিশ জন প্রতিনিধি ফিলাডেলফিয়া শহরে এই অধিবেশনে যোগদান করিল। একশত পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে জেমস্‌টাউনে প্রতিনিধিরা এইরূপভাবেই মিলিত হইয়াছিল; ১৬২০ সালে মেফ্লাওয়ার জাহাজেও 'মেফ্লাওয়ার ঘোষণাপত্রে'র স্বাক্ষরকারীরা

এইভাবে মিলিত হইয়াছিল। এখনকার অধিবেশন সমস্ত জাতির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তবুও আগ্রহ ও আবেগ পূর্বের মতোই ছিল প্রবল। বিপদে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সম্মিলিত আলোচনার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের মতো নিজের অধিকার রক্ষার জন্য দাঁড়াইতে হইবে। এই স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার দাবীর আওয়াজ উত্থিত হইয়াছিল বহুপূর্বে রুনিমিডের প্রান্তরে, ম্যাগনা কার্টা সহি করিবার সময়ে। সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

১৭৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিলের কুয়াশা-ভরা প্রভাত। ম্যাসাচুসেট্‌সের লেক্‌সিংটন নামে একটি ছোট শহরে বোস্টন হইতে বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য। একদল সশস্ত্র কৃষক — 'আমেরিকান মিনিট মেন' — তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বৃটিশ ক্যাপ্টেন তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দিলেন। "হটো, বিদ্রোহীর দল, এখনও হটছো না কেন?" তিনি বললেন। মার্কিণ ক্যাপ্টেন নিজের লোকদের বললেন: "শক্ত হয়ে দাঁড়াও, ওরা গুলী না করলে তোমরা আগে গুলী করো না। যদি ওরা যুদ্ধ চায়, তাহলে সেটা এখানেই সুরু হোক।"

গুলী আসিল। বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বৃটিশ সরকার দ্বিতীয়-বার ভুল করিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে আমেরিকানরা যুদ্ধ করিবে না। পরবর্তীকালে অন্যান্য গভর্নমেণ্টও এই চিন্তাই করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের এই ধারণাও ভুল ছিল।

বৃটিশ অভিযাত্রী দল বোস্টনে ফিরিয়া গেল — কিন্তু দুই শত তিয়াত্তর জন বৃটিশ সৈন্য নিহত বা আহত হইয়াছিল। ঔপনিবেশিকরা ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং পাথরের দেওয়ালের আড়াল হইতে গুলী করিয়া লাল-পোষাক পরিহিত সৈন্যদের হত্যা করিতে লাগিল। দুই মাস পর ১৭৭৫ সালের ১৭ই জুন,

তিন সহস্র বৃটিশ সৈন্য বোস্টনের অদূরবর্তী ব্রিডস্ পাহাড় ও বাঙ্কার পাহাড়ে মার্কিণদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিতে চেষ্টা করে। সোজাসুজি তিনবার আক্রমণ করিয়া তাহারা এই ঘাঁটি দখল করে, কিন্তু এই আক্রমণে তাহাদের এক সহস্রাধিক সৈন্য হতাহত হয়। অশিক্ষিত কিন্তু অব্যর্থ-সন্ধানী এই চাষা ও যন্ত্রীরা অবৈতনিক জেনারেলদের নেতৃত্বে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অবশ্য এই অবস্থা বেশীদিন চলিল না। তাহাদিগকে পরাজয়, বিপদ ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অনশন করিয়া তাহাদিগকে পলায়ন ও আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজস্ব রণ-নীতি আবিষ্কার করিয়াছিল। এবং তাহারা জর্জ ওয়াশিংটনের মত নেতা লাভ করিল, যিনি কোনদিনই পরাজয় স্বীকার করিতেন না।

এক বৎসর পর ১৭৭৬ সালের ৭ই জুন, কন্টিনেণ্টাল কংগ্রেসে ভার্জিনিয়ার রিচার্ড হেনরী লী প্রস্তাব করিলেন যে, "এই সমবেত উপনিবেশসমূহের নিজেদের অধিকারবলেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করা উচিত।" প্রায় এক মাস বিতর্কের পর, প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১৭৭৬ সালে ৪ঠা জুলাই, স্বাধীনতার ঘোষণা একটা নূতন জাতির জন্ম সূচনা করিল।

এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মার্কিণ জীবন ও মার্কিণ আদর্শের প্রধান স্মারকচিহ্ন দুইটির অন্যতর। প্রত্যেক মার্কিণ শিশুই স্কুলে ইহা পাঠ করিয়াছে, জাতীয় ছুটি উপলক্ষ্যে ইহা পড়িতে শুনিয়াছে, ঘোষণাপত্রের কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছে। ঘোষণায় যাহা উল্লিখিত আছে, তাহাকে আমরা স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করি, — তাহার জন্যই আমরা জীবন ধারণ করি, সেই আদর্শলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা জাতি হিসাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।

তাহা হইলে, এই ঘোষণাপত্রে মানুষের অধিকার, সরকার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন সম্পর্কে কী বলা হইয়াছে ?

উপনিবেশগুলি কেন ইংলণ্ড হইতে পৃথক হইতে চাহিয়াছিল তাহার কতকগুলি সুস্পষ্ট কারণও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার মর্মার্থ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিতে পাওয়া যাইবে :

"আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতেছি যে, সকল মানুষ সমানরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রত্যেক মানুষকেই স্রষ্টা কতকগুলি মৌলিক অধিকার দিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে জীবনধারণ, স্বাধীনতা এবং সুখলাভের প্রচেষ্টা অন্যতম। এই অধিকার রক্ষার জন্যই মানুষের মধ্যে শাসিতের সম্মতিক্রমে সরকার গঠিত হয়। যদি কোন সরকার এই আদর্শের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে তাহাকে উচ্ছেদ ও পরিবর্তন করিবার অধিকার জনগণের আছে এবং তাহার স্থানে নূতন এমন সরকারও তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, যে-সরকার তাহাদের মতে, আপন কর্মপদ্ধতি এবং ক্ষমতা দ্বারা তাহাদের সুখ ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সক্ষম। মানুষের বিচারবুদ্ধিই বলিয়া দিবে যে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত সরকার সামান্য ও তুচ্ছ কারণে পরিবর্তন করা উচিত নয়, সেই জন্যই অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে অন্যায় নিতান্ত অসহ্য না হইলে মানুষ প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে উচ্ছেদ না করিয়া বরং সেই অন্যায়কে সহ্য করিয়া চলে। কিন্তু যখন দেখা যায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও আত্মসাতের ফলে শাসন-ব্যবস্থা স্বৈরাচারে পরিণত হইতে চলিয়াছে, সেই সময়, নিজেদের অধিকারবলেই সেই সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা জনগণের কর্তব্য।"

এই বাণী শুধুমাত্র ত্রিশ লক্ষ ঔপনিবেশিকদের নহে, সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশেই ঘোষিত হইয়াছিল। ইহাকে পুনর্বার পাঠ করিলেই দেখা যাইবে, ইহা এখনও রহিয়াছে এবং স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক মানুষের কাছে ইহা একটি উদাত্ত আহ্বান।

ইহার মধ্যেই ঘোষণাপত্রের বিশেষত্ব নিহিত। শুধু যে ঔপনিবেশিকরা একত্র সম্মিলিত হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল তাহা নহে, এই ঘোষণা দ্বারা তাহারা কতকগুলি বিশ্বাস ও মৌলিক নীতিই ঘোষণা করিয়াছিল যে সকল মানুষই সমান, প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি অধিকার আছে; সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এই অধিকার রক্ষার জন্য, সরকার এই জন্য ক্ষমতা লাভ করে শাসিতদের সম্মতিক্রমে, কোন নৃপতি, ডিক্টেটর কিংবা কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর নিকট হইতে নহে, এবং কোন স্বৈরাচারী শাসককে উচ্ছেদ করিয়া নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উপায় নির্ধারণের অধিকার জনগণের আছে।

এই ভাবধারাগুলি একেবারে নূতন ছিল না। জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে এই ধরণের ভাবধারা বহুদিন হইতেই বর্তমান ছিল। ইংলণ্ডের হ্যারিংটন, লক্ ও সিডনী এবং ফরাসীদেশের নব-অভ্যুদিত সমাজের মনে এই ধরণের চিন্তাধারা কাজ করিতেছিল। কিন্তু এই দেশেই সর্বপ্রথম সংগ্রামরত ত্রিশ লক্ষ লোকের সংগ্রামী চেতনার বিশ্বাস ও নীতিরূপে ইহাকে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইল। ভবিষ্যতের স্বপ্নবিলাসরূপে ইহা ঘোষিত হয় নাই, স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপেই ইহার ঘোষণা। একজন মহান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম টমাস জেফারসন। তিনি ভার্জিনিয়ার অধিবাসী। কিন্তু দীর্ঘ একশত সত্তর বৎসর ধরিয়া অধিকাংশ মার্কিণবাসী স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ইহাকে এই রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। জেফারসন নিজে ভার্জিনিয়ায় প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি শূন্যগর্ভ এই কথাগুলি বলেন নাই, অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বাণী অগ্রগতির পথে যাত্রা সুরু করিল। আমরা বহুবার সেই বাণীর সম্মান রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছি, মানুষ মাত্রেরই এইরূপ হয়। কিন্তু ১৭৭৬ সালে যেমন বিশ্বাস করিয়াছিলাম আজও আমরা তেমনি

বিশ্বাস করি যে ইহাই স্বাধীন মানুষের পক্ষে প্রকৃত ঘোষণাবাণী। আমরা ইহা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার জন্য যত মূল্যই দিতে হউক না কেন।

ঘোষণাটি ছিল সাহসিকতাপূর্ণ — স্বাধীনতার জন্য উদাত্ত আহ্বান। কিন্তু ইহাতে বিপ্লবের অবসান হইল না। স্বাধীনতার সংগ্রাম দীর্ঘকাল নানা দুঃখ, বিপদ ও তীব্রতার মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। লেক্সিংটনের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া এই যুদ্ধ সাত বৎসর চলিয়াছিল।

ইহা শুধু গৃহযুদ্ধ নয়, ইহা ছিল জাতীয় যুদ্ধ। বহু আমেরিকাবাসী নিজেদের গভীর বিশ্বাসেই বৃটিশের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। অন্যান্যদের মতোই তাহারা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিল এবং যুদ্ধের শেষে কিংবা তাহারও পূর্বে ইহাদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছায় অথবা উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন জীবনযাত্রা সুরু করিবার উদ্দেশ্যে কানাডা, ইংলণ্ড কিংবা অন্যান্য বৃটিশ অধিকারভুক্ত দেশে চলিয়া যায়। তাহাদের বংশধরেরা নূতন জীবনযাত্রায় বৃটিশ কমনওয়েলথের শ্রেষ্ঠ নাগরিকরূপে পরিচিত হইতে পারিয়াছিল।

ইহা যে কেবল মার্কিণীদের সংগ্রাম ছিল তাহা নহে, ইংরেজরাও এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট জ্ঞানী ইংরেজ, পিট হইতে আরম্ভ করিয়া চার্লস্ জেমস্ ফক্স পর্যন্ত বহু ব্যক্তি, মার্কিণদের পক্ষ লইয়া জনমত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ইংলণ্ডকে কম ভালবাসিতেন তাহা নহে ; তবে তাঁহারা ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী।

এই যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বাধীনতাকামীদের যুদ্ধ। ফ্রান্স হইতে লাফায়েত, রশাম্বো এবং আরও অনেকে মার্কিণীদের সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিলেন। জার্মেনী হইতে আসিলেন ফন স্টুবেন এবং ড্য কাল্ব। পোল্যাণ্ড হইতে আসিলেন কোসিউস্কো এবং পুলাস্কি।

ইহা ছিল বিশ্বাসের সংগ্রাম। জে, লিভিংস্টন ও লী প্রমুখ ধনবান ও খ্যাতিসম্পন্ন পরিবার, দেশপ্রেমিকদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। অন্যেরা

ইংলণ্ডের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। বিপ্লবের প্রারম্ভে জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন তখনকার দিনে একজন সমৃদ্ধিশালী কৃষক। নিজের চাষবাসের উন্নতিবিধানের দিকেই তিনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। সৈনিক ও জরিপকারীরূপে তিনি সীমান্ত প্রদেশসমূহে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাঁহার চিন্তাধারাও ছিল অনেকটা রক্ষণশীল। তিনি সৎ ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তির জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন। সুচারু পোষাক পরিচ্ছদ, বিনম্র ব্যবহার, মধুর সঙ্গ, বন্ধুদের সঙ্গে তাসখেলা এবং কোনও কোনও দিন মাঠে মাঠে শিকার করা ছিল তাঁহার ভালবাসার জিনিস। তিনি নিজের জমিতে উৎপন্ন শস্যের নিখুঁত হিসাব রাখিতেন; নিজের পোষা কুকুর, শস্য-বিক্রীতে কত টাকা আসিল কিংবা আসিল না প্রভৃতি সব সম্বন্ধেই তিনি হিসাব রাখিয়া চলিতেন। কিন্তু তিনি সাত বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে মার্কিণবাহিনীর সেনাধ্যক্ষের কাজ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার উপরেই এই সংগ্রামী জনগণের প্রধান নির্ভর ছিল। দন্তশূল, বিপর্যয়, ঈর্ষ্যাপরায়ণ শত্রুর দল, অপমান, বিরুদ্ধ-প্রচার এবং বিদ্রূপ — কিছুতেই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। জার্সি উপত্যকায় তাঁহাকে শিয়ালের মত শত্রুরা তাড়া করিয়া বেড়াইয়াছে। তিনি তাঁহার বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে শীত ও ক্ষুধার অংশীদার হইয়াছিলেন, তবুও পরাজয় স্বীকার করেন নাই। দেশপ্রেমের জন্য তাঁহার চরম ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, তবুও তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া কিংবা পরিশ্রান্ত করিয়া দলে ভিড়ানো যাইত না — স্বাধীনতার আদর্শ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত কিংবা বিভ্রান্ত করা ছিল দুঃসাধ্য। ঠিক তাঁহার মতই ছিলেন পল রিভিয়ার। তিনি ছিলেন রৌপ্যকার, হরফ-বিক্রেতা, খোদাইকার — এক কথায় সর্ববিদ্যাবিশারদ। তাঁহার পিতার নাম এপোলোস্ রিভিয়ার, যিনি জার্সি দ্বীপ হইতে এই দেশে আসিয়াছিলেন — সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রতিভাবান যুবক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন,

বোস্টনের আইনজীবী জন অ্যাডামস্ এবং বোস্টনের প্রগতিবাদী বক্তা স্যামুয়েল অ্যাডামস্। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মানুষের স্বাধীনতা অপরিহার্য। এই বিশ্বাসের জন্য তাঁহারা সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধটা ছিল অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। বৃটিশ সেনাপতিরা যতই নিষ্ঠুর হউন না কেন, আমেরিকাস্থ বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে চাহিলেও মার্কিণ জনগণকে একেবারে ধ্বংস করিতে চাহেন নাই। গেজ, হাউয়েস, বারগয়েন ও কর্ণওয়ালিশের ইতিহাস মসীমলিন ছিল না। তাঁহারা সম্মানিত সৈনিকের নিষ্ঠা লইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য তাঁহারা কোন রণকৌশল অবলম্বন করেন নাই। কোন পক্ষই নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায় নাই।

কৌতুকপ্রদ যুদ্ধ সন্দেহ নাই। কারণ, বৃটিশ জনগণ এই যুদ্ধ সমর্থন করিত না। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, লর্ড জেফরে আমহার্স্ট তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম, উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে সৈন্যনিয়োগ কার্য শিথিল হইয়া পড়িল। বৃটিশ সরকার হেসি-ক্যাসেলের প্রিন্সের নিকট হইতে মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সরলচিত্ত হেসিয়ান কৃষকদের ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে আমেরিকায় পাঠাইতে লাগিল, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জনের জন্য। তাহারা জানিত না কিসের জন্য এই যুদ্ধ ও মৃত্যুবরণ। বিদেশী ও পেশাদারী সৈনিক বলিয়া মার্কিণীরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। তবুও যুদ্ধের শেষে এই কৃষকদের প্রায় দশ-হাজার লোক আমেরিকাতে থাকিয়া গেল, বিবাহাদি করিয়া বসতি স্থাপন করিল। নিজস্ব কিছু জমিজমাও লাভ করিল। আমেরিকায় তাহারা স্বাধীন মানুষরূপে বাস করিবার অধিকার পাইল। হেসি-ক্যাসেলে এই স্বাধীনতা তাহাদের ছিল না। আমেরিকা তাহাদিগকে গ্রহণ করিল এবং তাহারা চমৎকার নাগরিকরূপে পরিগণিত হইল।

ইহা ছিল আদর্শের সংগ্রাম। কাঁচুলিনির্মাতা টম পেইন এই আদর্শের প্রেরণাতেই পুস্তিকালেখকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছিলেন: "এই স্বাধীনতার অগ্নিশিখা একদিন নিবিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কয়লা কোনদিন ফুরাইবে না।" এই সংগ্রামের সকল আদর্শের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় না থাকিলেও অনেকেই ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। সমস্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রেই এরূপ হইয়া থাকে।

আমেরিকার পক্ষে এই যুদ্ধে কৃষক, যন্ত্রী, ব্যবসায়ী, জেলে, নাপিত, শিকারী, কর্মকার সকলেই যোগদান করিয়াছিল। কর্মকার হইতে সেনাপতি হইয়াছিলেন গ্রীণ, শিকারী হইতে জেনারেল মর্গান, কৃষক হইতে সেনাধ্যক্ষ জর্জ ওয়াশিংটন। শান্তিপ্রিয় মানুষের দল শান্তভাবেই এই যুদ্ধের ধাক্কা সহ্য করিয়াছিল। তাহাদের ঘরবাড়ী, শস্যক্ষেত্র সমস্তই পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল। ইহার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগকে তাহারা অভিশাপ দিলেও স্থানত্যাগ না করিবার জন্য তাহারা ছিল কৃতসংকল্প। ইউরোপে এই যুদ্ধকে কেহ কেহ সমর্থন, কেহ বা নিন্দা করিতেছিল। এই যুদ্ধ ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করিল এবং সংবাদপত্রের পাঠকদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। তাহারা সংবাদপত্রে কতকগুলি নূতন নাম ও শব্দের সহিত পরিচিত হইয়াছিল — যেমন, 'ওয়াশিংটন' ও 'আমেরিকা' এবং 'সাধারণ বিচারবুদ্ধি', 'সকল মানুষই সমান'।

পরিশেষে ফ্রান্স ও ফ্রান্সের নৌবহরের সাহায্যে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৭৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর ভার্জিনিয়ার ইয়র্কটাউনে কর্ণওয়ালিশ আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রাথমিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৭৮২ সালের ৩০শে নভেম্বর; চূড়ান্ত সন্ধি হয় ১৭৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। আমেরিকার সর্বসাধারণ, নরনারী, ধনী ও দরিদ্র, সীমান্তবাসী, ব্যবসায়ী, কৃষক সকলে মিলিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাত বৎসর যুদ্ধের পর তাহারা একটা জাতির সৃষ্টি করিল।

সংবিধান

এই জাতির স্বরূপ কি? ইউরোপ বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে এই দেশের দিকে চাহিয়া রহিল। নূতন জাতি, তাহার দুর্বলতা তখনও কাটে নাই। আশা, দুরাশা ও বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্য দিয়া একটা পরীক্ষা চলিতেছিল মাত্র। ইহাকে জাতি বলা চলে না।

এই দেশের কতকগুলি অতি উর্বর ভূমি যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এই দেশের বহু যোগ্য ব্যক্তি দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, অথবা বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন জাতি ঋণের চাপে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। এই দেশের মুদ্রামান এত দূর হ্রাস পাইয়াছিল যে 'মার্কিণ মুদ্রার চেয়ে নিকৃষ্ট' এই ধরণের একটা কথা বহুল প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ব্যবসা বানিজ্যের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। শিল্পপ্রচেষ্টা যুদ্ধে ব্যাহত হইয়া একরূপ স্থিতাবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কোন পাওনা টাকা ছিল না।

সর্বাপেক্ষা অসুবিধা ছিল এই যে ইহা একটি রাষ্ট্র ছিল না, কারণ তেরোটি রাষ্ট্র একসঙ্গে যুদ্ধে নামিয়াছিল কিন্তু সর্ববিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতৈক্য ছিল না। দেশের সরকার কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস তখন পর্যন্ত ছিল একটা জটিল বিতর্ক সভার সামিল। সৈন্যবাহিনী বিজয় লাভ করিয়াও কোন পারিশ্রমিক লাভ করে নাই।

ইহা নিশ্চিত ছিল যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই দেশ আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে তেরোটি কলহমান ক্ষুদ্র জাতিতে, হয়তো অন্য কোন অধিকতর শক্তিশালী বৈদেশিক শক্তির হাতে গিয়া পড়িবে, অথবা কোন একটা রক্তক্ষয়ী অন্তবিপ্লব ও অরাজকতায় বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

যদি ইহাদের কোনটাই না ঘটে তাহা হইলেও এই দেশের একজন রাজা,

ডিক্টেটর, সম্রাট বা একজন শক্তিমান নেতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হইবে। হয়তো ইউরোপের কোন একজন ক্ষুদ্র নৃপতিকেই এ দেশের বিপজ্জনক পরিস্থিতির দায়িত্বভার গ্রহণে প্ররোচিত করা সম্ভব হইবে। অথবা মার্কিণীরা নিজেরাই হয়তো তদনুরূপ একজন স্বৈরাচারী নেতা বাছিয়া লইবে।

তবুও একটা আশা, একটা আদর্শের স্বপ্নের জন্যই সর্বশ্রেণীর লোক ঐক্য-বদ্ধ হইয়া এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, অনেকে প্রাণ বিসর্জনও দিয়াছিল। তাহারা কি বৃথাই সংগ্রাম করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল?

যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন কিংবা যাঁহারা ইহার কাহিনী শুনিয়াছিলেন, লাফায়েৎ, ফক্স, বারগয়েন, প্রুশিয়ার রাজা, ফ্রান্সের সম্রাট এবং ইংলণ্ডাধিপতি সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের বিস্ময়াবেশ কাটিবার পূর্বেই একটি নূতন জাতি গড়িয়া উঠিল।

দেশের স্তম্ভ যাঁহারা

প্রত্যেক বিপ্লবের পরেই এমন একটা সময় আসে যখন বিপ্লবী মানুষদের একত্র মিলিত হইয়া, হিসাব নিকাশের পরে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। আমেরিকাতেও এমন সময় আসিল যখন ১৭৮৭ সালের ২৫শে মে ফিলাডেলফিয়াতে শাসনতান্ত্রিক সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সমবেত হইলেন।

প্রতিনিধিরা সংখ্যায় ছিলেন পঞ্চান্ন জন, তাঁহাদের মধ্যে নয় জনের জন্ম বিদেশে। একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পক্ষে সংখ্যাটা পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু এই প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন ওয়াশিংটন, ফ্রাঙ্কলিন, ম্যাডিসন, হ্যামিলটন, র‍্যাণ্ডলফ, ম্যাসন, ডিকিনসন প্রমুখ সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ মার্কিণ মনীষিবৃন্দ। কেবলমাত্র জেফারসন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন কূটনৈতিক কার্যোপলক্ষে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন।

প্রতিনিধিদের বয়স ছিল গড়ে বিয়াল্লিশ বৎসর। তাঁহারা বৃদ্ধও নহেন, একেবারে অল্পবয়স্কও নহেন। যুদ্ধ ও বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় তাঁহারা ছিলেন বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁহারা একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহারা বহু বিষয়ের উপর তর্কবিতর্ক ও আলোচনা করিলেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলিকে ঈর্ষ্যা করিত। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করিলেন। অধমর্ণগণ কিঞ্চিৎ অনায়াসলব্ধ অর্থের আশায় ছিলেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের একনিষ্ঠ সমর্থকগণ ফেডারেশনের পরিবর্তে কনফেডারেশন গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। শেষ-পর্যন্ত তাঁহারা সংবিধানটি প্রণয়ন করিলেন।

'একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ যুক্তরাষ্ট্র গঠন' সংবিধানের প্রথম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কীরূপে তাঁহারা ইহা কার্যকরী করিলেন?

তাঁহারা এই প্রকার প্রথায় সরকার গঠন করিলেন: দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত কংগ্রেস—প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেট, একজন প্রেসিডেণ্ট, একটি সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ বিচারালয়।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কংগ্রেসই সকল আইন প্রণয়ন করিবেন। প্রেসিডেণ্ট সেইগুলিকে সম্মতি দান করিয়া কার্যে পরিণত করিবেন। আইনের কোন কোন বিতর্কমূলক ধারার উপর সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

বৎসরে একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, আলোচনা করিয়া আইন পাশ করিবার জন্য। প্রেসিডেণ্ট (বিশেষ জরুরী অবস্থা ব্যতীত) এই সভা আহ্বান করিতে পারিবেন না, ইহা বন্ধ করিতে কিংবা বাতিল করিতেও পারিবেন না। প্রেসিডেণ্ট চাহেন কিংবা না চাহেন, কংগ্রেসের অধিবেশন বসিবেই।

জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। কংগ্রেসকে প্রচুর ক্ষমতা দান করা হইল। সংবিধানে এই ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা আছে। এইগুলির মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার, সৈন্যবাহিনী গঠন ও পোষণ, করধার্য করণ, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, জাতির জন্য ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তেরোটি রাষ্ট্র বর্তমান। তাই কংগ্রেসের দুইটি পরিষদকে ভিন্নভাবে গঠন করা প্রয়োজন।

প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের কার্যকাল দুই বৎসর। প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা থাকিবে বেশী, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কম। প্রতিনিধি পরিষদই সমস্ত অর্থসম্বন্ধীয় বিল উত্থাপন করিবেন।

কিন্তু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য স্থির হয় যে সেনেটে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই দুইজন করিয়া সেনেটর থাকিবেন, রাষ্ট্র যত বড় কিংবা ছোট হউক না কেন। তাঁহাদের কার্যকাল ছয় বৎসর। প্রত্যেকটি বিল-ই প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করিবার পূর্বে পরিষদ ও সেনেটে উত্থাপিত হইতে হইবে।

চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতেও প্রচুর ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তিনিই সমস্ত আইনের প্রয়োগ ও তাহা কার্যকরী করিবেন। কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত কোন বিল যদি তিনি পছন্দ না করেন তাহা হইলে তিনি তাহা নাকচ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি উভয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ইহা পুনরায় পাশ করে তাহা হইলে প্রেসিডেন্টের নাকচ প্রস্তাবও বাতিল হইয়া ইহা আইনে পরিণত হইবে।

প্রেসিডেন্ট সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে কোন দেশের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন। সেনেটের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে তিনি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ এবং অন্যান্য শাসনকার্য সম্পর্কিত কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের উপর যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা অর্পিত আছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ যতদিন 'সন্তোষজনক ব্যবহার' বজায় রাখিতে পারেন ততদিন পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা সুপ্রীম কোর্টকে কংগ্রেসের প্রণীত আইনাদির চূড়ান্ত বিচার-বিশ্লেষণের জন্য গঠন করিয়াছিলেন কিনা তাহা আজ বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এই ক্ষমতাই ইহা গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহা স্বীকৃতও হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট যদি কংগ্রেসের কোন আইনকে 'সংবিধান বহির্ভূত' বলিয়া ঘোষণা করেন তবে সে আইন বাতিল হইয়া যায়। ভবিষ্যতে হয়তো সুপ্রীম কোর্টের পরবর্তী কোন বিচারপতি ঐ আইনকেই 'সংবিধান সম্মত' বলিয়াও ঘোষণা করিতে পারেন এবং এরূপ কখনও কখনও ঘটিয়াছেও। এই স্বাধীনতা ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ সুপ্রীম কোর্ট আইনের তত্ত্বাবধায়ক এবং দ্রুত-প্রণীত বিধানের অঙ্কুশরূপে কাজ করিয়া থাকেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন সুপ্রীম কোর্টই আজ পর্যন্ত ইহুদীকে ইহুদী বলিয়াই নির্যাতন করিতে হইবে, এইরূপ কোন আইন বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন নাই — কারণ এই আইন কংগ্রেস কর্তৃক পাশ হইয়া প্রেসিডেন্টের সম্মতি লাভ করিলেও সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ধারাই স্পষ্ট লঙ্ঘন করিবে।

এই সব প্রথা কিছু জটিল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই প্রথা পরিবর্তন-যোগ্য ও কার্যকরী দুই-ই। ইহাকে যথার্থই 'সংযম ও সামঞ্জস্যের প্রথা' বলা হইয়া থাকে। সরকারের কোন বিভাগের হস্তেই সম্পূর্ণ কিংবা স্বৈরাচারী ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সরকারের তিনটি বিভাগ — আইন, শাসন ও বিচার — সম্মিলিতভাবে জাতির শাসনব্যবস্থা চালাইয়া থাকে।

প্রতিষ্ঠাতারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জনগণই ক্ষমতার উৎস। সেই জন্যই তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি দ্বারাই একটি কংগ্রেস (বর্তমানে দুইটি

পরিষদ) গঠিত করিয়াছিলেন। পাছে বৃহৎ ও জনসংখ্যাবহুল রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলিকে কোণঠাসা করিয়া দেয় এই জন্য তাঁহারা সেনেটে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্যই দুইটি ভোটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সেনেটরদের কার্যকাল প্রতিনিধিদের কার্যকালের তিনগুণ ধার্য করিয়াছিলেন। সেনেটররা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি হইবেন বলিয়াই ধরা হয়, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সদস্য থাকিয়া তাঁহারা পরিষদ ও প্রেসিডেণ্ট উভয়ের কার্যেই সংযম ও সামঞ্জস্য বিধান করিবেন।

তাঁহারা একজন শক্তিমান রাষ্ট্রনায়ক চাহিয়াছিলেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এই অভিজ্ঞতা ছিল যে এক একটা কংগ্রেসই রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে 'কমিটি' দ্বারা জাতি পরিচালনা করা যায় না। তাই তাঁহারা প্রেসিডেণ্টের হাতে প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন — এই ক্ষমতা এত প্রচুর, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়ে, যে মার্কিণ প্রেসিডেণ্টই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান্ শাসনাধিকারীদের অন্যতম। কিন্তু তাঁহারা ইহাও চাহেন নাই যে প্রেসিডেণ্ট স্বৈরাচারী শাসক হইবেন। তাই প্রতি চার বৎসর অন্তর সভাপতি নির্বাচনের বিধান তাঁহারা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিধানও করিয়াছিলেন যে প্রেসিডেণ্টের নাকচ সত্ত্বেও কংগ্রেস আইন পাশ করিতে পারিবে। এইরূপে তাঁহারা প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন ধারা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন।

সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাঁহারা সর্বোচ্চ বিচার সম্পর্কীয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আরেকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া গিয়াছিলেন যে, সংবিধান সংশোধন করা চলিবে। ইহা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় দলিল ছিল না। পরবর্তীকালে ইহাতে পরিবর্তন করা গিয়াছে। একুশ বার অনুরূপ সংশোধন করা হইয়াছে — যদিও সংশোধনের পদ্ধতি কঠিন ও দীর্ঘ।

কোন কোন জিনিসের ব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই। তাঁহারা মন্ত্রি-সভার ব্যবস্থা রাখেন নাই; পররাষ্ট্র-সচিব, সমর-সচিব, প্রভৃতি পদের ব্যবস্থাও তাঁহারা করেন নাই, যদিও 'শাসনকার্যের বিভাগ' এবং 'বিভাগীয় কর্তৃপদের' প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রাজনৈতিক দল কিংবা দলীয় প্রথার কথা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের জন্য 'ভোটার গোষ্ঠী'র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যদিও তাহা কার্যকরী হয় নাই। আইনানুযায়ী এখনও প্রেসিডেণ্ট 'ভোটার গোষ্ঠী'র দ্বারা নির্বাচিত হন, তবে প্রকৃতপক্ষে এই ভোটদাতারা দলীয় টিকিট লইয়া দলের মনোনীত ব্যক্তিকেই প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য ভোট দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থাপনার অধিকাংশ জিনিসই সময়ের পরিবর্তনের পরেও টিকিয়া আছে। এই প্রথায় ত্রুটি রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কাজ করিয়া যাইতেছে।

অতঃপর এই সংবিধানকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হইল। এজন্য তেরোটি রাষ্ট্রের মধ্যে অন্ততঃ নয়টির সমর্থন প্রয়োজন হইয়াছিল। বহু আলোচনার পর তাহাও করা হইল।

কিন্তু তবুও সকলে সন্তুষ্ট হইল না।

একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই সরকারের শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ নাগরিকের কী কী অধিকার রহিল?

১৭৮৯ সালের শরৎকালে নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল সংবিধানে দশটি সংশোধন যোজনা করা হইল। ইহা 'অধিকারসমূহের বিল' নামে অভিহিত। নিম্নে এগুলি দেওয়া হইল:

ধারা ১

কংগ্রেস কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে কিংবা স্বাধীন ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ করিয়া কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না; কিংবা বাক্‌স্বাধীনতা অথবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে না; শান্তভাবে জনসভা করিবার

অধিকার এবং অভিযোগ দূর করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

ধারা ২

যেহেতু স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি সুশৃঙ্খল গণবাহিনীর প্রয়োজন, সেইজন্য জনগণের অস্ত্র রাখা কিংবা বহন করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

ধারা ৩

শান্তির সময়ে কোন সৈন্যকেই গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন গৃহে আস্তানা করিতে দেওয়া হইবে না। যুদ্ধের সময়েও আইন-বহির্ভূত ভাবে ইহা করা হইবে না।

ধারা ৪

নাগরিকদের দেহ, গৃহ, দলিলপত্র, সম্পত্তি প্রভৃতির উপর অন্যায় খানাতল্লাসী কিংবা গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে যে অধিকার আছে তাহা লঙ্ঘন করা হইবে না; শপথ বা সমর্থনযুক্ত সম্ভাব্য কারণ ব্যতীত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করা হইবে না। এরূপ হইলেও তল্লাসীর নির্দিষ্ট স্থান এবং কোন্ ব্যক্তি ও কোন্ কোন্ জিনিস তল্লাস করা হইবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

ধারা ৫

যুদ্ধ কিংবা জনসাধারণের বিপদের সম্ভাবনা আছে এইরূপ অবস্থায় কর্মনিযুক্ত স্থল, নৌ কিংবা গণবাহিনীর লোক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকেই জুরীর অভিযোগ ব্যতীত নরহত্যা কিংবা তদ্রূপ ঘৃণিত কোনও অপরাধের জন্য ফৌজদারী সোপরদ্দ করা যাইবে না। একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে দুইবার তাহার প্রাণ কিংবা দেহের পক্ষে অনিষ্টকর শাস্তি দেওয়া যাইবে না; কিংবা কোন ফৌজদারী

মামলায় তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না। আইনের বিধান ব্যতীত তাহাকে নিজের প্রাণ, স্বাধীনতা অথবা সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি জনসাধারণের জন্য গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ৬

সমস্ত ফৌজদারী বিচারে আসামী যে রাষ্ট্র বা জিলায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেখানকার নিরপেক্ষ জুরীর সাহায্যে দ্রুত প্রকাশ্য বিচারের অধিকার ভোগ করিবে। এই জিলাসম্পর্কে পূর্বাহ্নে আইনের অনুমোদন লইতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাহার কারণ জানাইতে হইবে। তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষীকে দেখিবার সুযোগ দিতে হইবে। তাহার স্বপক্ষে সাক্ষীলাভের অবশ্য গ্রহণীয় অধিকার দিতে হইবে এবং নিজের পক্ষে আইনজীবীর সাহায্য লাভের অধিকারও দিতে হইবে।

ধারা ৭

সাধারণ মামলায়, যেখানে দাবীর পরিমাণ বিশ ডলারের ঊর্ধ্বে সেখানেই জুরীর সাহায্যে মামলা বিচারের অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে। সাধারণ মামলার যে আইন রহিয়াছে তদনুসারে ব্যতীত জুরী কর্তৃক নির্ধারিত কোন মামলা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন আদালতে পুনর্বিচার করা যাইবে না।

ধারা ৮

জামীনের জন্য অত্যধিক অর্থ আদায় করা হইবে না, অত্যধিক জরিমানাও করা হইবে না। নিষ্ঠুর কিংবা অপ্রচলিত শাস্তিবিধানও করা হইবে না।

ধারা ৯

সংবিধানে কতকগুলি বিশেষ অধিকার উল্লিখিত আছে বলিয়া তাহার বহির্ভূত যে সকল অধিকার জনসাধারণ ভোগ করিতেছে তাহা ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না।

ধারা ১০

সংবিধান কর্তৃক যে সকল ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদত্ত হয় নাই কিংবা বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষমতা এই সকল রাষ্ট্র অথবা জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

শিশু সাধারণতন্ত্র

জর্জ ওয়াশিংটনকে নির্বিঘ্নে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিণ বিপ্লবের অবসান ঘটিল।

ইহা প্রকৃতই একটি বিপ্লব — দীর্ঘ ও বিপদসংকুল যাত্রাপথে নানা কষ্ট, সংগ্রাম ও তিক্ততার মধ্য দিয়া প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতির পরিবর্তনের মধ্যে এই বিপ্লবের পরিসমাপ্তি। বিপ্লব তাহার সন্তানদের গ্রাস করিল না, বিপ্লবোত্তর প্রতিহিংসাকাণ্ডও সংঘটিত হইল না। যে সমস্ত হেসিয়ান এই দেশে রহিয়া গেল তাহাদিগকে তাড়া করিয়া ধ্বংস করা হইল না। কয়েকজন রাজানুগত প্রজা ফিরিয়া আসিবার পর কঠোর ব্যবহার লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্যান্যরা ফিরিয়া আসিয়া নূতন রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে শান্তভাবেই বসতি স্থাপন করিয়া লইল। রক্তস্নান কিংবা বহিষ্কার কোনটাই হইল না। তীব্র রাজনৈতিক বিরোধ ছিল বটে, কিন্তু কোনও ক্ষুদ্র দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিল না। দুইটি স্থানীয় ও ক্ষুদ্র বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। এই বিদ্রোহের সঙ্গত কারণও ছিল। শেজ বিদ্রোহ হয় ১৭৮৬

সালে, ১৭৯৪ সালে হয় হুইস্কি বিদ্রোহ। সরকার তাহার ক্ষমতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিদ্রোহ দমন হইয়া যায়। কিন্তু এইজন্য কাহাকেও ফাঁসী দেওয়া হয় নাই। শেজ ও তাঁহার সহযোগীদের মুক্তি দেওয়া হয়। হুইস্কি বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করেন।

এইরূপ করা হইল কেন? মার্কিণীরা নিশ্চয়ই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ধার্মিক জাতি ছিল না। কোনদিনই অধিকতর ধার্মিক তাহারা ছিল না। তাহারা ছিল ভাগ্যবান, বিভিন্ন মতবাদের লোকদের বসবাসের অধিকার স্বীকার করে এইরূপ একটি শাসনপ্রথা প্রাপ্তিতেই তাহারা ছিল ভাগ্যবান। এই শিশু প্রজাতন্ত্রকে যাঁহারা প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদের পাইয়াও মার্কিণ জাতি ভাগ্যবানই ছিল।

তাহারা ছিল মানুষ। তাহাদের দোষ ছিল। তাহারা ভুল করিত। কিন্তু তাহারা কেহই স্বৈরাচারী হইতে চাহিত না। এমন কেহই ছিল না যে মনে করিত, ভিন্ন মতাবলম্বীকে হত্যা করা কিংবা কারারুদ্ধ করিয়া রাখাই রাষ্ট্রশাসনের একমাত্র উপায়।

একটা স্বপ্ন ছিল তাহাদের মনে — স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা সচেতনভাবেই চেষ্টা করিত। কখনও তাহাদের এই চেষ্টা জাঁকাল, কখনও বা হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাহারা নিজেদের আদিম রোমান বলিয়া মনে করিত। প্লুটার্কের রোমান সাধারণতন্ত্রে যে রোমানদের কথা তাহারা পড়িয়াছিল সেই রোমান। কোন এক ছোট শহরের আইনজীবী যখন সংবাদপত্রে কোন চিঠি লিখিতেন তখন তিনি 'সিনসিনাটাস' কিংবা 'ব্রুটাস জুনিয়র' এইরূপেই স্বাক্ষর করিতে পছন্দ করিতেন। ঢিলা পোষাক পরিহিত জর্জ ওয়াশিংটনের একটি অবাঞ্ছিত মর্মরমূর্তিও রহিয়াছে। এই সব দেখিয়া হাসা সহজ — বিদেশী পর্যটকরা হাসিতও। কিন্তু যখন এই লোকেরাই 'সাধারণতন্ত্রীয় গুণ'

এবং 'সাধারণতন্ত্রীয় অনাড়ম্বরতার' কথা বলিত তখন ইহার অর্থ বুঝিয়াই বলিত। তাহারা এই স্বপ্নকে সার্থক করিবার জন্য চেষ্টা করিত, এমন কি প্রাচীন রোমের সেই ইতিহাস অপেক্ষাও উন্নততর সাধারণতন্ত্রের স্বপ্নই তাহারা দেখিত।

এই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের কয়েকজনের জীবনী বিচার করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য জর্জ ওয়াশিংটন। শুধুমাত্র বিপ্লবের সাফল্যই নহে, মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের সাফল্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠাও বহুলাংশে এই ব্যক্তির চরিত্রবলের উপরই নির্ভর করিয়াছিল।

একটি দিক হইতে দেখিতে গেলে ওয়াশিংটনকে কঠোর, উদাসীন, গম্ভীর প্রকৃতির ও রাশভারী বলিয়াই মনে হইবে। তিনি জনতার ঘামের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না। সামাজিক দিক দিয়া যাঁহারা তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, তাঁহাদের সহিত তিনি সহজে মিশিতে পারিতেন না। তিনি ছিলেন শক্ত মানুষ—দেহে এবং মনে। কিন্তু তাঁহার মনে কোন বিশিষ্ট উদ্ভাবনী শক্তি বা দার্শনিকতার ছোঁয়া ছিল না। মেজাজ ছিল গরম, তবে তিনি তাহা সংযত করিয়া রাখিতেন; কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেন। জনতার হৃদয় জয় করিবার মতো বাগ্মিতা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তবুও—

তিনি কখনও কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেন না। যে জাতির তিনি জন্ম দিয়াছিলেন, তাহার নিকট হইতে ইচ্ছা করিলে তিনি যে-কোন পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু একবার একটি নির্বোধ ছোট দলের পক্ষ হইতে যখন তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় যে, তিনি যেন এই নূতন জাতির রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি শুধুমাত্র এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করেন নাই, স্পষ্ট ও তীব্র ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন: "যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের

উত্তরাধিকারী এবং আমার জন্য শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই চিন্তা মন হইতে দূর করিবে এবং এই ধরণের মনোভাব কোনদিন তোমাদের নিকট হইতে বা অন্য কাহারও নিকট হইতে যেন আমার কাছে প্রকাশ না পায়।" তিনি নিজের গ্রামের বাড়ীকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন অথচ বিপ্লবের ছয় বৎসর তিনি একবারও তাহা দেখেন নাই। তিনি বিত্তবান ছিলেন, এবং সম্পত্তি সম্পর্কে তিনি সতর্কই ছিলেন, অথচ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে ও তাঁহার সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার আর্থিক আয় কমিয়া গেলেও কোন দিন এই বিষয়ে একটি কথাও তিনি বলেন নাই। নিজের দেশ ও দেশ-বাসীর সেবাই তাঁহার জীবনাদর্শ ছিল। অনেক সময়ই দেশবাসীর বিচারবুদ্ধি, তাহাদের দেশপ্রেম এবং অন্য সকল ব্যাপারে তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেন, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাদের জন্যই কাজ করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় তাহাদের নিকট হইতে তিনি বিদ্রূপও লাভ করিয়াছেন, কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটনই ছিলেন দেশবাসীর একমাত্র নির্ভরস্থল। তিনি ছিলেন একটি বিরাট অচঞ্চল চারিত্রিক দৃঢ়তার বাস্তব রূপ। তিনি যে-কাজ ন্যায্য বলিয়া বুঝিতেন যে কোন মূল্যে তাহা সাধন করিতেন। তাঁহার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অন্ত ছিল না। তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসী কোন সাধারণ ডাক-নামে ডাকিত না। কিন্তু তাঁহাকে তাহারা 'জাতির জনক' আখ্যা দিয়াছিল অন্তরের সরল সত্যকেই প্রকাশ করিবার জন্য।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন; দ্বিতীয় জন্ অ্যাডামস্। নিউ ইংলণ্ডবাসী জন অ্যাডামস্ ছিলেন বেঁটে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্বাধীনচেতা আইন-জীবী। তিনি কৃষকের ছেলে; তাঁহার প্রপিতামহ ছিলেন বেকার ছুতার মিস্ত্রী। ১৬৩৬ সালে তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে এই দেশে চলিয়া আসেন। অ্যাডামস্ ছিলেন স্পষ্টভাষী, সর্বত্রই তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ

করিতেন। তিনি কার্যক্ষম ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন এবং বিনা স্বার্থেই দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।' নিউ ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়াও তিনি ভার্জিনিয়াবাসী ওয়াশিংটনকে কন্টিনেণ্টাল সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন ওয়াশিংটনই এই কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। তিনি বিপ্লবী হইলেও রক্ত-লিপ্সু ছিলেন না। 'বোস্টন টি-পার্টিকে তিনি একটা চমৎকার আন্দোলনরূপে দেখিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান নীতিবিদরূপে তিনি টমাস জেফারসনের সহিত নীতি লইয়া কলহ করিয়াছিলেন; তাঁহার ডায়েরীতে জেফারসন সম্পর্কে তীব্র কটূক্তিপূর্ণ কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষজীবনে তিনি এই কলহ এইরূপ মাধুর্য ও সম্মানের সহিত মিটাইয়া লইয়াছিলেন যে পরবর্তীকালে তাঁহাদের চিঠিপত্র দেখিয়া মনে হইত, দুইজন বৃদ্ধ কিন্তু অক্লান্তকর্মী দেবতা যেন মর্ত্যের মানুষদের ক্ষুদ্র অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনারত। আইনজীবী অ্যাডামস্ কোনদিন নাবিকের কাজ করেন নাই, কিন্তু তিনি মার্কিণ নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট-রূপে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। তবুও প্রেসিডেণ্টের কর্তব্যকর্ম তিনি আন্তরিক ও দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। মানুষ তাঁহাকে বিরক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধা করিত, কারণ সহজে ভালবাসার মতো সহজ সরল কোনও গুণ তাঁহার ছিল না। তিনি আমেরিকার প্রথম রাজনৈতিক দার্শনিকদের অন্যতম। তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা আজও নিউ ইংলণ্ডবাসীদের মধ্যে প্রতিভাত হয়।

তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট টমাস জেফারসন ছিলেন ভার্জিনিয়াবাসী। তাঁহার সার্বভৌম গুণাবলী অল্পকথায় চরিত্রবিশ্লেষণে সম্ভবপর নয়। দীর্ঘকায়, ধূসরচক্ষু, শক্তগড়ন, ও বালি-রঙ্ চুল — জেফারসন ছিলেন একজন আবিষ্কারক, চিন্তাশীল, লেখক, দার্শনিক এবং বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি জনগণের শক্তি ও গুণাবলী সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি

একটি নূতন ও উন্নত ধরণের লাঙল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও তাঁহারই রচনা। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট স্থপতি। নিজস্ব পরিকল্পনায় প্রস্তুত তাঁহার বাসগৃহ 'মন্টিসেলো' পৃথিবীর সুন্দর গৃহগুলির অন্যতম। তিনি নূতন জিনিসের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন — মানুষ ভবিষ্যতে কী হইবে, মানুষ ইচ্ছা করিলে কী হইতে পারে এই সকল বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি শিল্পানুরাগী ছিলেন, বেহালা বাজাইতে জানিতেন এবং সঙ্গীত রচনার দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল। অ্যাডামসের ন্যায় তিনিও ব্যক্তিগতভাবে সমসাময়িক ব্যক্তিদের মূল্যবিচারে তিক্ততা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে অনেক সময় তিনি অসারল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই আমেরিকার সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক ব্যক্তি; জনগণের উপর তাঁহার গভীর বিশ্বাস জীবনে সকল সময়েই অবিচলিত ছিল। দীর্ঘজীবনে মানুষ ও শাসন-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ১৮১৬ সালে লিখিয়াছিলেন: "সত্য নীতিগুলি একবার নির্ধারণ করিয়া অবিচলিত ভাবে তাহাকে অনুসরণ করিয়া চল। জনগণের উন্নতি দেখিয়া ধনবানরা গর্জন করিবে, কাপুরুষেরা মিথ্যা আর্তনাদ তুলিবে; তাহা দেখিয়া ভয়ে নীতি বিসর্জন দিবে না...সত্যিকারের সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, সম্পত্তি ও শাসনব্যবস্থায় সমান অধিকারের উপর...আমি জানি আইন ও সমাজব্যবস্থা মানুষের মনের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া চলিবে। নূতন সত্য আবিষ্কারের ফলে মানুষের চিন্তাধারার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থাও সমান তাল রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে।" ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা রূপে তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার ও ন্যায়-বিচারে বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন: "ভয়কে দূর করিয়া সম্মুখে আশা লইয়া আমি তরণী বাহিয়া চলিয়াছি।"

ভার্জিনিয়ায় তাঁহার সমাধি। এই সমাধিটি এমন একজন ব্যক্তির যিনি

মানুষের উপর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট দুইটি দিকই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তবুও কোনদিন জনগণের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর তাঁহার বিশ্বাসের পরিবর্তন করেন নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ছিলেন প্রতিভাবান, বক্তা, আকর্ষণীয় ব্যক্তি, সাহসী সৈনিক, সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনের প্রিয় সামরিক সহচর এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অর্থসচিব। জেফারসন চাহিয়াছিলেন, আমেরিকা স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল কৃষক নাগরিকের দেশ হইবে। হ্যামিলটনের দৃষ্টি শিল্প ও পুঁজির দিকে আকৃষ্ট হইল। জনগণের উপর তাঁহার বিশেষ কোন আস্থা ছিল না। তিনি মনে করিতেন, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান লোকদের দ্বারাই তাহাদিগকে পরিচালন ও শাসন করিতে হইবে। তিনি স্বীকার করিতেন যে তিনি ধনবান ও সম্ভ্রান্ত লোকদেরই পছন্দ করেন বেশী। একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষেত্রে তিনি সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না —জনতার গুঞ্জরণের উপর তাঁহার আদৌ কোনও আস্থা ছিল না। কিন্তু এই জন্য হ্যামিলটন বিপ্লবী ছিলেন না এ কথা মনে করা ভুল। তিনি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র চাহিয়াছিলেন যাহা পরিচালিত হইবে শ্রেষ্ঠ ও সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা। রাজতন্ত্র হইলেও ক্ষতি নাই— কিন্তু তিনি এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চাহিতেন যাহা সমস্ত পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয় হইবে। জাঁকজমক পছন্দ করিলেও অর্থের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না এবং তিনি অর্থসঞ্চয় করিতেও পারেন নাই। জেফারসন ও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রতিদ্বন্দ্বী। জনগণ সম্পর্কে দুইজনের মতবাদ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু যে সংবিধানের বলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম, তাহার কৃতিত্ব অন্য কোন ব্যক্তির চেয়ে হ্যামিলটনের কম ছিল না। জাতীয় সম্পত্তির পুনরুদ্ধারও সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই কৃতিত্ব। আত্মসম্মানের প্রশ্নে একটি অবাঞ্ছিত মল্লযুদ্ধে তিনি

মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার চেয়ে কম ব্যক্তিগত সাহসসম্পন্ন ব্যক্তি হইলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াইয়া যাইতে পারিতেন। মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে জাতির উপর তাঁহার ব্যক্তিত্বের গভীর রেখাপাত করিয়া তিনি লোকান্তরিত হন।

শিশু সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের চারজনের এই ছিল পরিচয়। তাঁহাদের স্বভাবের মধ্যে মানুষে মানুষে যতটা সম্ভব ততটা পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের আদর্শের একজায়গায় ছিল মিল — জাতিকে স্বাধীনরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আরও অনেক ব্যক্তিরই আবির্ভাব ঘটিয়াছিল — সুইসজাতীয় গ্যালাটিন, ভার্জিনিয়ার লী ভ্রাতৃগণ, দক্ষিণ ক্যারোলাইনার রাটলিজ — ম্যাডিসন ও মনরো, ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একবার করিয়া প্রেসিডেন্ট পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন; ইঁহাদের প্রত্যেকেই পূর্ববর্তিগণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সীমান্তের অঞ্চলসমূহে আবার অন্য শ্রেণীর লোকেরা গড়িয়া উঠিতেছিল। বিপ্লবের কয় বৎসর ধরিয়াই শিকারী জাতি ও প্রথম বসতকারীর দল আলঘেণী পর্বতের গিরিবর্ত্ম দিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। সেই অঞ্চলে তাহাদের জন্য কোন আইনকানুনের বাধা-নিষেধ ছিল না, কিন্তু প্রথমেই তাহারা একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের আইন প্রণয়ন করিল। কেণ্টাকী ও টেনেসী প্রদেশে এই নবাগতরা নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার শাসনব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া লইল।

রেড-ইণ্ডিয়ানদের সহিত যুদ্ধে পারদর্শী কষ্টসহিষ্ণু সীমান্তবাসীরা ঘণ্টা-খানেকের জন্য তাহাদের রাইফেল তুলিয়া রাখিয়া একত্র মিলিত হইল। তাহারা নিশ্চিতরূপে জানিত না কোন্ দলের সঙ্গে তাহারা থাকিতে চায়, কিন্তু তাহারা ইহা জানিত যে তাহাদের স্বাধীন হইতে হইবে। বিপ্লবের কাহিনী তখনও তাহাদের নিকট দূরবর্তী একটা জনশ্রুতির মতোই ছিল — কিন্তু তাহারা রক্তের বিনিময়ে জমি ক্রয় করিয়াছিল, এই

জমি তাহারা স্বাধীনভাবে নিজেদের অধিকারে রাখিতে চাহিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রাজনীতি বাস্তবরূপ ধারণ করিল। স্বাধীনতা তাহাদের কাছে শুধুমাত্র বাস্তবই নহে, ইহা ছিল একটা প্রয়োজন।

এই ভাবে পাঁচজন প্রেসিডেন্টের নির্বাচন নির্বিঘ্নেই হইয়া গেল। ইংলণ্ডের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ১৮১২ সালে। এ যুদ্ধের কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। সেই সময়েই বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে এই নূতন আশা, নূতন পরীক্ষা ও নূতন পৃথিবীর নূতন সাধারণতন্ত্র হয়তো তাহার প্রসব-বেদনার শেষে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু বিশ্ব-পরিস্থিতির সঙ্গে এই দেশ কি করিয়া মানাইয়া লইয়াছিল?

বৃটেন ও ইউরোপ হইতে যাহারা ভাগ্যান্বেষণে এই দেশে আসিত তাহাদের কাছে ইহা ছিল আশ্রয় ও আশার প্রতীকস্বরূপ। অনেকে আসিয়া তীব্রভাবে হতাশও হইয়াছিল, কারণ তৈরী-করা স্বর্গোদ্যান তাহারা পায় নাই। কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া এই নূতন দেশের আদর্শকে ভুয়া বলিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার যথেষ্ট উন্নতি করিয়া লইল।

কিন্তু, দেশ বা জাতি হিসাবে ইহা তখনও বৃহৎ কিংবা বিশিষ্ট শক্তিতে পরিণত হয় নাই। কতকগুলি বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ বৈশিষ্ট্য মাত্র দেখা গিয়াছিল। জেফারসন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যুক্তরাষ্ট্র বার্বারি জলদস্যুদের সমর্থন করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। মার্কিণ নৌবাহিনী ঘাটি হইতে চার সহস্র মাইল দূরে টহল দিয়া সেই দুঃসাহসীদের নিকট হইতে যুক্তরাষ্ট্রের তারকা ও রেখালাঞ্ছিত পতাকার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য আদায় করিয়া লইয়াছিল। জেফারসন প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই ফ্রান্সের নিকট হইতে লুইসিয়ানার বিস্তৃত ভূখণ্ড ক্রয় করা হয়। ১৮১২ সালের যুদ্ধে বৃটিশেরা যখন ওয়াশিংটন সহর দখল করে এবং হোয়াইট হাউস জ্বালাইয়া দেয়, সেই সময় অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন নামে জনৈক সেনাধ্যক্ষ নিউ অর্লিয়ান্সের যুদ্ধে বৃটিশের বিরুদ্ধে একটা বড় রকমের জয়লাভ করেন। মার্কিণ সৈন্যদল

ও ক্ষুদ্র নৌবাহিনী পৃথিবীর বৃহত্তম নৌশক্তির বিরুদ্ধে পরম সাহসিকতার সহিত রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাই হোক, ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে এই সব ঘটনা সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর প্রতিভাত হইত। যুক্তরাষ্ট্রের সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ কোন সেনাবাহিনী ছিল না, কোন বিরাট নৌবহরও ছিল না। পৃথিবীর মানচিত্রের এক স্বল্পপরিচিত কোণে এই দেশ তখনও একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নই হইয়া রহিয়াছিল। তবুও এই ক্ষুদ্র দেশ তাহার ক্ষুদ্রশক্তি দিয়া বিশ্বপরিস্থিতিতে স্বীয় কর্তব্য পালন করিতেছিল।

মার্কিনীদের কাছে পরিস্থিতিটা ছিল কতকটা অন্যরকম। তাহারা ঐভাবেই সমস্যার সমাধান করিয়া সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা একটা বৃহৎ সেনাবাহিনী কিংবা বড় নৌবহর চাহিত না। তাহারা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় কলহে যোগ দিতে চাহে নাই। তাহারা নিজেদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে চাহিয়াছিল। অন্যান্য জাতির সহিত তাহারা ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং ভাব ও বস্তুসামগ্রীর আদানপ্রদান করিতে এবং মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিত। অন্য কিছু নয়।

শুধু ইহা চাহেই নাই, তাহারা ইহা করিয়াও ছিল। উত্তর আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল দুইটি বিরাট সমুদ্রের দ্বারা ছিল সুরক্ষিত। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের জাতিসমূহ সামরিক দিক দিয়া শক্তিশালী ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য জাতির আক্রমণের ভয় ছিল না, তাই নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাহারা নির্বিঘ্নে দেশের জীবনযাত্রা পরিচালনা করিতে পারিত। দীর্ঘকাল তাহারা এইরূপই করিয়াছিল।

শুধু একটা সম্ভাবনা রহিয়া গেল। কোন শক্তিশালী দেশ পশ্চিম ভূভাগে উপনিবেশ স্থাপনের ইচ্ছায় যদি উত্তর অথবা দক্ষিণ আমেরিকায় এমন একটি উপনিবেশ গড়িয়া তোলে যাহা ইউরোপের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকিবে, তাহা হইলে সেই দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধীও হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া, ১৮২৩ সালে, নূতন পৃথিবীর স্প্যানীশ

উপনিবেশগুলির সঙ্গে স্পেনের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর, যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেমস্ মনরো মার্কিণ নীতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘোষণা করিলেন :

"বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই নীতি ঘোষণা করা হইল…যে আমেরিকার মহাদেশ দুইটিতে যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাহার কোন স্থানে ভবিষ্যতে ইউরোপীয় কোন শক্তিকে উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না।"

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে বৈদেশিক কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে মনরো ঘোষণা করিলেন :

"যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা অতলান্তিক সমুদ্রের অপর তীরবর্তী দেশসমূহের সহযাত্রী জনগণের শান্তি, সুখ ও স্বাধীনতা আন্তরিকভাবে কামনা করে। ইউরোপীয় শক্তিসমূহের পারস্পরিক যুদ্ধে আমরা কখনও কোন অংশ গ্রহণ করি নাই, ইহা আমাদের নীতিও নহে। যখন আমাদের নিজেদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় কিংবা হইবার আশঙ্কা থাকে তখনই আমরা তাহার প্রতিবাদ করি এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি। এই ভূভাগের গতিবিধির সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং ইহার সঙ্গত কারণও আছে…মিত্রশক্তিসমূহের রাজনীতি এই দিক দিয়া আমাদের চেয়ে ভিন্ন। এই পার্থক্যের কারণ, দেশসমূহের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্নতা। বহু রক্ত ও সম্পদের বিনিময়ে যে দেশ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহার রক্ষাকল্পে…সমগ্র জাতি দৃঢ়সংকল্প। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রশক্তির সঙ্গে এখন যে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা তাহাদিগকে এই কথা জানাইয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করি যে, এই ভূভাগের কোন অংশে যদি তাঁহারা নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রসারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্নকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে। বর্তমানে

ইউরোপীয় শক্তিগুলির যেসব উপনিবেশ ও আশ্রিত অঞ্চল রহিয়াছে, তাহার ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করি নাই, করিবও না। কিন্তু যেসব রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং যাহা আমরা…স্বীকার করিয়া লইয়াছি, সেই সব রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব, নির্যাতন কিংবা শাসন করিবার কোন প্রচেষ্টা যদি কোন ইউরোপীয় শক্তি করে, তাহা হইলে ঐ কার্যকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতার প্রকাশ বলিয়াই ধরা হইবে।"

ইহাই মনরো-নীতি নামে খ্যাত। মার্কিণ রাষ্ট্রনীতিতে আজিও এই নীতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রয়োজনের তাগিদেই ইহার জন্ম। ইহার পূর্বে নূতন পৃথিবীর নূতন ঘটনাবলী সম্পর্কে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলিয়াছিল। কূটনৈতিক ভাষাচাতুর্য পরিবর্জন করিয়া এই নূতন দেশ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিল: "বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক এই নূতন পৃথিবীর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। যদি তাহা করা হয়, তবে আমরা, যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা, তাহা রোধ করিব।" পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিসমূহ এই ঘোষণার কোন প্রতিবাদ করিল না।

কেন?

সেই সময়, ইউরোপ নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের বিধ্বস্ততা ও আতঙ্ক হইতে সবেমাত্র সারিয়া উঠিতেছে। ফ্রান্স ও স্পেনের পশ্চিমপ্রসারি ঔপনিবেশিক প্রেরণার প্রথম ধাক্কা তখন নিঃশেষিত। পশ্চিম গোলার্ধে স্পেনের যে উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় জয় করিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। বৃটেন ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভয়ে ও লাতিন আমেরিকার সাধারণতন্ত্রগুলির সঙ্গে মৈত্রীরক্ষার জন্য মার্কিণ নীতির সমর্থন করিল। ফ্রান্স শান্তি চাহিল। রাশিয়া ইতিপূর্বেই সানফ্রান্সিসকোতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কোন ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আলাপ

আলোচনার পর রাশিয়াও আমেরিকায় তাহার অধিকার ৫৪°৪০´ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে রাজী হইল। এইভাবে একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই নহে, পশ্চিম ভূমণ্ডলের প্রত্যেকটি দেশেরই স্বাধীন নীতি অবলম্বনের অধিকার স্বীকৃত হইল।

যুক্তরাষ্ট্রও তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সব সময় ন্যায়বিচার করে নাই। কিন্তু তাহারা এবং যুক্তরাষ্ট্র ইহা ভালভাবেই জানে, বৈদেশিক কোন শক্তি এই ভূমণ্ডলের কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

মনরো-নীতির বাস্তব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন দুনিয়ার সমস্ত কলহ, সংঘর্ষ ও শক্তির দ্বন্দ্ব হইতে এই নূতন পৃথিবীকে দূরে রাখা। জেফারসন আরও স্পষ্টভাষায় এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন: "আমাদের প্রথম ও প্রধান নীতি ইউরোপের সংঘাত-সংঘর্ষ হইতে নিজেদের দূরে রাখা। আমাদের দ্বিতীয় নীতি, কোন প্রকারেই অতলান্তিকের এই তীরের দেশসমূহে ইউরোপকে হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়া। ...ইউরোপের ঘটনাবলী শংকার মেঘ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। ...কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি না আমাদের শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। আমি এই বিশ্বাস না লইয়া কিছুতেই মরিব না যে স্বাধীনতা ও জ্ঞানের আলোক অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ...যদি বর্বরতা ও স্বৈরাচারের মেঘ ইউরোপের বিজ্ঞান ও স্বাধীনতাকে পুনরায় আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখন এই দেশ সেই আলোক ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবে।..."

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষণ। বহুকাল ধরিয়া মার্কিণীরা এই ধারাতেই চিন্তা করিত। তাহারা নূতন একটা-কিছু করিতেছিল এবং এসম্বন্ধে তাহারা সচেতন ছিল — মানুষের জীবনযাত্রা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অধিকার সম্পর্কে

নূতন পরীক্ষা তাহারা স্থরু করিয়াছিল। এই নূতন পরীক্ষাকার্যে তাহারা একক প্রচেষ্টাই চাহিয়াছিল। সঙ্গতভাবেই হোক কি অসঙ্গতভাবেই হোক, তাহারা মনে করিত তাহারা মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জাতি। যেসব ইউরোপীয় এই মহৎ পরীক্ষায় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে উৎস্থক ছিলেন তাঁহারা এই দেশে সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। কিন্তু এই দেশে আসিবার পূর্বে প্রাক্তন স্বদেশের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য বিসর্জন দিয়া আসিতে হইত। তাঁহাদের এই কথা ঘোষণা করিতে হইত যে, মার্কিণ জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম ও ন্যায়-সঙ্গত — ইহার বিরুদ্ধ-সমালোচনার তীব্রভাবে প্রতিবাদ করা হইত।

এইরূপ মনোভাবের মধ্যে ভাল ও মন্দ দুয়েরই বীজ নিহিত ছিল। এই মনোভাবের ফলে মার্কিণীরা আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন ও নিজেদের স্বাধীনতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠে — তাহারা সর্বদাই ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে ঝুঁকি গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল ছিল। ইহাতে তাহারা অহঙ্কার, বাগাড়ম্বরতা ও নিজেদের সমালোচনায় অসহিষ্ণুতার একটা অপবাদ অর্জন করিয়াছিল। যখন কোন মার্কিণবাসী ইউরোপীয় পর্যটকদের কাছে তাহাদের দেশের ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলের কাঠের বাড়ীগুলি দেখাইয়া বলিত, এইখানে বৃহৎ নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে, তখন ইউরোপীয় পর্যটক প্রদর্শকের কথায় হাসিবে কিংবা পাগলের উক্তি মনে করিয়া মৃদুস্বরে প্রবোধ দিবে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু মার্কিণীদের দৃষ্টি তাহাদের চোখের সামনে যাহা দেখিত, সেই ছুঁচালো মুখ শূকরছানা কিংবা রুগ্ন ও বিবর্ণ মানুষগুলোর উপরই কেবল নিবদ্ধ ছিল না, পঞ্চাশ বৎসর পরে এইখানে কী রূপান্তর সাধিত হইতে পারে সেই দিকেই ছিল তাহাদের দৃষ্টি। তাই সে কোন একটি স্থানকে নিউ এথেন্স, পালমাইরা কিংবা ইডেন নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। কাজেই যদি কোন ইউরোপীয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিত যে পশ্চিম মেগালোপোলিসে

নারী-শিক্ষায়তনটি বিদ্যাকেন্দ্ররূপে অক্সফোর্ডের সমকক্ষ নহে, কিংবা অর্ধেক-গড়িয়া-উঠা ওয়াশিংটন শহরে পার্থেননের মতো সুন্দর কোন দ্রষ্টব্য বস্তুই নাই, তাহা হইলে মার্কিণীরা মনে করিত ইউরোপীয়টি সংস্কারাচ্ছন্ন, সেইজন্যই স্বাধীনতার কোন অবদানই সে প্রশংসা করিতে পারিল না। ইউরোপীয়টিও তখন মার্কিণবাসীদের অজ্ঞ ও অহঙ্কারী শিশু বলিয়াই মনে করিত। এইরূপেই পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝা সুরু হয়, এবং এখনও তাহা আছে।

আমেরিকা, ইউরোপের সহিত রাজনৈতিক ও আত্মিক দুই দিক দিয়াই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল। একথাও বলা যায় যে, ইউরোপও বিশ্বের সমস্যা সমাধানে আমেরিকার নিকট কোন সহযোগিতা কোনদিন চায় নাই।

মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অথবা সচিব মিঃ স্মিথ একজন সাধারণ পোষাক পরিহিত ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত কোন উপাধিও তাঁহার নাই, এই কারণেই ইউরোপীয় কোন রাজ-দরবারে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। অবশ্য যদি তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করা হইত। কিন্তু ইউরোপের স্বার্থবিজড়িত কোন কাজে তাঁহার কিংবা তাঁহার দেশের কোন পরামর্শ বা সহযোগিতা চাওয়া হইত না। মার্কিণীদের প্রতি বন্ধুত্ব ছিল, তাহাদের পরীক্ষাকার্যে সকলের আগ্রহও ছিল। ডানিয়েল ওয়েবস্টারের ন্যায় প্রথিতযশা মার্কিণ নাগরিক ইংলণ্ড কিংবা ইউরোপ পরিভ্রমণে গেলে নিশ্চয় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতেন। ক্রমশঃ দেশত্যাগীদের স্রোত আমেরিকার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল—মানুষ ও অর্থের স্রোত বহিয়া আসিয়াই এই নূতন দেশ গড়িয়া তুলিবে। তখনও আমেরিকা সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের এবং এ-সবে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য কোন কোন সময় প্রাচীন মহাদেশের দিকেই চাহিয়া থাকিত। কিন্তু এই সংযোগ থাকা সত্ত্বেও, এবং যদিও বৃটেন ও ইউরোপ ক্রমশঃ উপলব্ধি

করিল যে মার্কিণ ব্যক্তি-মানসও পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে পারে, তথাপি দুইটি ভূমণ্ডল ধীরে ধীরে চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

ইহা অবশ্যম্ভাবীই ছিল।

১৮৪০ সালে কোন একজন সাধারণ মার্কিণ নাগরিকের কাছে ইউরোপ ছিল অতীতের একটি সংগ্রহশালা। সেখানে গেলে দেখিবার মতো আকর্ষণীয় জিনিস অনেক ছিল, কিন্তু তাহা সংগ্রহশালা, অতীতে যেসব জিনিসকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা সে করিয়াছে, তাহারই প্রতীক।

সে সময়কার সাধারণ ইউরোপীয়দের কাছে আমেরিকা ছিল অর্ধ-সভ্য অরণ্যভূমি, যেখানে রেড-ইণ্ডিয়ানরা মানুষের মাথার চামড়া তুলিয়া ফেলে। মাসতুতো ভাই জন সেখান হইতে বহু আজগুবি চিঠি লিখিয়াছে, কিন্তু ভায়ার বুদ্ধি তো চিরদিনই ছিল অদ্ভুতধরণের।

এমনি করিয়া দেশটি গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় দেশের সীমানা পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তর-পশ্চিমে সর্বত্রই বাড়িতে লাগিল। এক কথায় এই আয়তনবৃদ্ধির গতি ছিল অতুলনীয়। আপেলেচিয়ান পর্বতপ্রাচীরের পশ্চাতে যে তেরোটি রাষ্ট্র এতকাল আবদ্ধ ছিল, সেইগুলি আজ সহসা প্রসারিত হইয়া পারদ-স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। ১৮২১ সালের মধ্যে আরো এগারোটি রাষ্ট্র ইউনিয়নে যোগদান করে—ভারমণ্ট, মিসিসিপি, আলাবামা, ইলিনয়েস, ইণ্ডিয়ানা, কেণ্টাকী, টেনেসি, লুইসিয়ানা, মেইন, মিজৌরী এবং ওহায়ো। গৃহসন্ধানী মানুষের দল তাহাদের সর্বস্ব লইয়া, হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া চলিল পশ্চিম দিকের বিপদসংকুল অথচ উর্বর এলাকা অভিমুখে। সঙ্গে লইল স্ত্রী-পুত্র, পছন্দমতো জিনিসপত্র, বাইবেল, আরও কিছু বই, নিজের বন্দুক, সমস্তই। তাহারা নৌকায় নদী পার হইল, রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও উপেক্ষা করিল, দুঃখে কষ্টে অনশনের

মধ্য দিয়া তাহারা মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। বন্য হংসের ডাক শুনিয়াই যেন নূতন কোনও প্রেরণায় দুঃসাহসী একক মানুষের দল সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা সুরু করিয়াছিল। এইরূপ বহু কষ্ট সহ্যের পর ড্যানিশ, সুইডিশ, জার্মান, আইরিশ প্রভৃতি বহিরাগতের দল গিয়া পৌছিল একটা রিক্ত উন্মুক্ত অঞ্চলে। সেইখানেই তাহারা তাহাদের বাহন পশু-গুলিকে আহার দিল এবং প্রথম নিজেদের ঘর বাঁধিল।

কেন?

হয়তো তাহারা বলিত, নিজেদের জীবনযাত্রা উন্নত করিবার জন্যই তাহারা গিয়াছিল। কোন কোন সময়ে নিজেদের উন্নতিসাধন তাহারা করিত। কিন্তু যে দেশ ফেলিয়া এই নূতন অঞ্চলে তাহারা আসিয়াছিল, সেই দেশও যথেষ্ট উর্বরা ছিল।

মার্কিণ জাতির এই আত্মপ্রসারণ ও গতিবেগের কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা নাই। ইহা ঘটিয়াছিল ইহাই একমাত্র যুক্তি। সীমান্তের উর্বর মাটির সম্ভাবনা যেমন প্রত্যেক দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিত, তেমনই আকর্ষণ করিত অযোগ্য ব্যক্তিদের যাহারা পুরাতন দেশে সুবিধা করিতে পারে নাই। যেসব অঞ্চলে যাযাবর রেড-ইণ্ডিয়ানদের বসবাস ছিল, অকস্মাৎ সেখানেই মানুষের পদধ্বনি শোনা গেল — পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ। একজন মানুষের যতদিন আয়ুষ্কাল, সেই সময়ের মধ্যে তাহারা তিন সহস্র মাইল প্রস্থের একটি মহাদেশ অবরোধ ও জয় করিয়া লইয়াছিল। সংগ্রাম, রক্তপাত এবং যুদ্ধের দ্বারা এই অভিযানের মূল্য দিতে হইয়াছিল। মার্কিণ বসতিস্থাপনকারীরা টেক্সাসে আসে ১৮২৩ সালে। ১৮৩৫ সালে তাহারা মেক্সিকোর সরকারের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন টেক্সাস সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘ দশ বৎসর এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া গেল, টেক্সাসও স্বীয় স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিল। ১৮৪৬ সালে

মেক্সিকোর সহিত যুদ্ধের ফলে শুধুমাত্র টেক্সাস্ নয়, নিউ মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্নিয়া ক্রমবর্ধমান সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে বহু চিন্তাশীল আমেরিকাবাসী আক্রমণাত্মক বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। বহু লোক আবার আমেরিকার আদর্শের সার্থকতা বলিয়া ইহাকে সমর্থন করিয়াছিল। ইহা বলা যাইতে পারে যে টেক্সাস্‌বাসীরা একবার স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করিয়া পুনরায় মেক্সিকোর অধীনে যাইতে রাজী ছিল না। টেক্সাসে মার্কিণীদের স্থায়ী বসতিস্থাপনের পরে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরাভিমুখী যাত্রা ইহাকে বাদ দিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। এমনি করিয়াই যুক্তরাষ্ট্রের সীমানায় নূতন ও বিস্তৃত ভূভাগ যুক্ত হইল।

একান্ন বৎসরের মধ্যে মার্কিণীরা অতলান্তিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে গিয়া পৌছায়। মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপিত হয়, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল আবিষ্কৃত হয় বসতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে, আল্‌পস্-এর মতো পর্বত ও ডানিয়ুব অপেক্ষা প্রশস্ততর নদীও তাহারা অতিক্রম করিয়াছিল। দীর্ঘদিন তাহারা ক্ষারসমন্বিত সমতলভূমি ও মৃত্যু-উপত্যকার মরুভূমির উপর দিয়া চলিতে চলিতে মানচিত্রে উল্লিখিত অজ্ঞাত মার্কিণ-দেশীয় মরুভূমি এলাকায়ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা ও মন্থরগতি মার্কিণ ভাষা লইয়া আসিল। সকল জাতির লোক সেইখানে গিয়া সমবেত হইল — ইহুদী ফিরিওয়ালা, ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের প্রাক্তন সেনানী ও '৩০ ও '৪৮ সালের নির্বাসিতের দল, বুভুক্ষু আইরিশ কৃষক — সকলেই একটা সুযোগ লাভের আশায় সেইখানে গিয়া বসতি স্থাপন করিল।

ইতিমধ্যে আরেকটি বিরাট অভিযান সুরু হইল। শিল্প-বিপ্লবের প্রেরণায় বহু শ্রমিকের কাজ যখন যন্ত্রের সাহায্যে হইতে আরম্ভ করে, সেই সময় আমেরিকার শিল্প ও শিল্পোৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। মার্কিণীরা ইউরোপীয়

শিল্পকে ক্রয় করিয়া, ঋণ করিয়া আনিয়া, কোন সময় অনুকরণ করিয়া কিংবা বেমালুম চুরি করিয়া, কখনও বা নিজেরা উন্নতধরণের আবিষ্কার করিয়া তাঁত, ইঞ্জিন এবং সর্বপ্রকার শক্তি-চালিত যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিল। নিউ-ইংলণ্ডের ইয়াঙ্কিরা নিপুণ ঝালাইকার, কনেক্‌টিকাটের কৃষকেরা ছিল সর্ব-বিদ্যাবিশারদ। তাহাদের অঞ্চলে জল-চালিত বৈদ্যুতিক শক্তি, কয়লা, লোহা ও অন্যান্য সকল রকমের ধাতুই ছিল। তাহারা নিপুণ কারু-শিল্পী ছিল, তাহাদের তৈরী জাহাজ পৃথিবীর মধ্যে এক বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তাহারা স্বাধীনভাবে নিজেদের শিল্পক্ষমতা ও আবিষ্ক্রিয়ার শক্তি কাজে লাগাইত। ফুলটনের পূর্বেই অন্ততঃ চারজন লোক স্টীমবোট আবিষ্কার করিয়াছিল, কিন্তু ফুলটনের আবিষ্কৃত স্টীমারই হাডসন নদীর জলে সর্বপ্রথম ভাসানো হয় এবং তাঁহার খ্যাতি ঘোষণা করে। আবিষ্কারক ও শিল্পীকে আমেরিকা সম্মান দিত। এলি হুইট্‌নি নামে জনৈক ইয়াঙ্কী তুলা-ছাড়ানো যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল।

যন্ত্রটি ছিল খুবই সরল ও মার্কিণ আবিষ্কারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহার পূর্বে, আমেরিকার দেশীয় তুলা হইতে অত্যন্ত কষ্ট করিয়া হাত দিয়া বীজ ছাড়াইতে হইত। একজন নিগ্রো-শ্রমিক সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া মাত্র কয়েক পাউণ্ড তুলা ছাড়াইতে পারিত। তাই দেশীয় তুলার উৎপাদন খুব লাভজনক ছিল না, কারণ ক্রীতদাস শ্রমিকের দ্বারা কাজ করাইলেও উহা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ছিল।

এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া গেল। ১৭৯২ সালে ইহা আবিষ্কারের পর সমস্ত দক্ষিণ এলাকায় ইহা প্রচলিত হইয়া যায়। ১৭৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তুলার উৎপাদন ছিল ১,৪০,০০০ পাউণ্ড, ১৮১০ সালে তাহা বাড়িয়া হয় ৮,৯০,০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার পূর্বে দক্ষিণে তামাক ও নীলের চাষ-ই ছিল বিশেষ অর্থকরী। এখন তুলা শীর্ষস্থান অধিকার করিল। পৃথিবীর সমস্ত বাজারেই তুলার অত্যন্ত চাহিদা। তুলা

উৎপাদনের অর্থই ছিল ক্রীতদাস, যত বেশী উৎপাদন, ক্রীতদাসের সংখ্যাও ততই বেশী প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল।

ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রো দাসপ্রথা ছিল বহুদিনের। পূর্বে উত্তরাঞ্চলেও কিছু কিছু প্রচলন ছিল, কিন্তু সেখানে ইহা প্রায় অপ্রচলিত হইয়া গয়াছিল। কোন কোন শস্যের পক্ষে এই অঞ্চলের আবহাওয়া উপযোগী ছিল না। নিউ ইংলণ্ডের চাষবাস, কিংবা সীমান্তের কৃষিকার্যও পারিবারিক প্রচেষ্টার উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে নির্দিষ্ট কোন লাভজনক শস্য ছিল না। দাসপ্রথাও লাভজনক ছিল না — তাহার প্রতিবন্ধক ছিল অসংখ্য।

দক্ষিণ দেশের পক্ষে এই অসুবিধা ছিল না। সেখানকার আবহাওয়া দাসপ্রথার উপযোগী ছিল। নরম নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, আফ্রিকা হইতে সদ্য-আগত নিগ্রো দাসের দল সেই আবহাওয়ায় বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। প্রথম দিকে সেখানে একটি শস্য উৎপাদিত হইত — তামাক। অপটু লোকেরাও সেই সব জমিতে প্রচুর চাষ করিতে পারিত।

তবুও, দক্ষিণাঞ্চলে দাসপ্রথাটা একসময় প্রায় উঠিয়া যাইবার মত অবস্থা হইয়াছিল। ওয়াশিংটন ও জেফারসন উভয়েই এই প্রথাটির অবলুপ্তি আশা করিয়াছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিও তাহাই করিতেন। মানবিক ন্যায় বা অন্যায়ের কথা বাদ দিলেও, ইহা ছিল কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুন্নত ও আয়াসসাধ্য পন্থা। একজন স্বাধীন মানুষ তাহার নিজের জমির প্রতি যতটুকু যত্ন লইতে সক্ষম, এই দাসেরা, একমাত্র আনুগত্য ছাড়া, সেইরকম কিছুই দিতে পারিবে এমন আশা করা চলিত না। জমির মালিক যদি ভদ্রব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে বৎসরের পর বৎসর এই ক্রীতদাসদের দায়িত্বও তাঁহাকে বহন করিতে হইত। লাভ করার এই প্রথার সহিত বিস্ময়কর ভাবেই তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হইত।

তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অবস্থার পটপরিবর্তন হইয়া গেল। অধিক তুলা উৎপাদনের অর্থ অধিক দাস, অধিক দাসের অর্থই অধিকতর তূলা। উভয়ের যোগফল অধিকতর সম্পদ। তাই, দক্ষিণাঞ্চলে দাসপ্রথা অবলুপ্ত হওয়া দূরের কথা, ইহার শিকড় আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল।

অবশ্য সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলবাসীরাই ক্রীতদাসের মালিক ছিল না। অল্প কয়েকজন ব্যক্তি বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাসের মনিব ছিল। তাহারা ছিল মুষ্টিমেয়। অন্যরা কেহ কয়েকজন, কেহ বা একজন ক্রীতদাস রাখিত। তাহাদের সংখ্যা ছিল আরও কম। বিরাট জমির মালিকদের পক্ষে দাসপ্রথা ছিল লাভজনক; মধ্যবিত্ত মালিকদের পক্ষে কিছুটা, কিন্তু ক্ষুদ্র ও দরিদ্র চাষীর পক্ষে অর্থ ব্যয়ে দাস ক্রয় করা সম্ভবপর ছিল না। এই ক্রীতদাসের মালিকেরা ছিল ধনী এবং সমাজের মোড়লশ্রেণীর লোক। তাহারাই সমাজকে চালাইত।

এই ভাবে যখন পশ্চিম দিকে মার্কিণীদের জনবসতিস্থাপন ক্রমশই প্রসারিত হইতে থাকে তখন দুই ধরণের জীবনযাত্রা পাশাপাশি গড়িয়া উঠিল: উত্তরাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান শিল্প ও স্বাধীন কৃষিকার্য এবং দক্ষিণাঞ্চলের চাষবাস ও দাসপ্রথা।

কোন এক সময়ে এই দুইটি প্রথার সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল এবং সেই সংঘর্ষ ঘটিলও। দুইটি প্রথার মধ্যে এত পার্থক্য ছিল যে সংঘর্ষ না ঘটিয়াই পারে না। আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন: "যে গৃহ নিজের মধ্যেই বিভক্ত, সে গৃহ দাঁড়াইতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি এই সরকার চিরকালের জন্য অর্ধেক দাস ও অর্ধেক স্বাধীন নাগরিকের প্রথা বরদাস্ত করিতে পারে না। আমি চাই না যুক্তরাষ্ট্র ভাঙিয়া পড়ুক, আমি চাই না এই গৃহ ধ্বসিয়া পড়ুক। কিন্তু আমি আশা করি, এই পার্থক্য আর থাকিবে না। ইহাকে হয় ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে নতুবা সম্পূর্ণ পৃথক অন্য কিছু গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

সাধারণতন্ত্র গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল সময় উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষমতার লড়াই চলিয়াছিল, কখনো প্রচণ্ড, কখনো কম, কখনো আবার প্রচণ্ড সংঘর্ষ। নূতন যে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছিল সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই রাজ্যগুলি অধীন থাকিবে না স্বাধীন হইবে? তাহারা উত্তরাঞ্চলের না দক্ষিণাঞ্চলের সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করিবে? যদি কোন পক্ষ সমস্তগুলি নূতন রাজ্যই জয় করিয়া লয়, তাহা হইলে কংগ্রেসে অন্যপক্ষ ভোটে হারিয়া যাইতে বাধ্য। এই লইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু ইহাতে সমস্যার সমাধান হইত না, সংঘর্ষটা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকিত মাত্র। দক্ষিণাঞ্চল একসময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল — প্রথম পাঁচজন প্রেসিডেন্টের চারজনই ছিলেন ভার্জিনিয়াবাসী। তাহারা দেখিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়াই তাহারা ক্রমশঃ উত্তরাঞ্চলের অধীন হইয়া পড়িতেছে। দক্ষিণাঞ্চলের পক্ষে নিজস্ব শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার অর্থ সমগ্র চাষ-প্রথা হইতেই দূরে সরিয়া আসা।

এই প্রশ্নের সহিত আরও দুইটি নীতিগত প্রশ্নের সংযোগ হইল।

প্রথমতঃ, রাজ্যগুলির অধিকার। রাষ্ট্র-সংযোগের সংজ্ঞা কি — প্রসার কতটুকু? এই অন্তর্ভুক্তি কি চিরস্থায়ী ও অচ্ছেদ্য, না কি কোন রাজ্য কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারত্ব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিবে? কোন্ কথাটির উপর বেশী জোর দেওয়া হইবে, 'সংযুক্ত' না 'রাষ্ট্র'? যুক্তরাষ্ট্র কি একটা বৃক্ষের মতো, যাহাকে হত্যা না করিয়া কাটিয়া ভাগ করা চলিত না? না কি, ইহা একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার মতো, ক্ষতিপূরণ না করিয়াও যাহার অস্তিত্ব লোপ করা চলিত? এই ধরণের প্রশ্নই সমস্ত দেশবাসীর মনকে বছরের পর বছর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল — কোন্ পরিচয় প্রধান, মার্কিণ না ভার্জিনিয়াবাসী?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, যেদেশে মানুষের স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, সেই দেশে মানুষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখার প্রথা থাকিতে পারে কি না? এই দুইটি প্রশ্নই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

উত্তরাঞ্চলে একদল ধর্মপ্রাণ নরনারী এই দাসপ্রথাকে মানুষের উপর দুঃসহ অন্যায় বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। কোন কোন সময় তাঁহারা তীব্রভাষাতে নিন্দা করিতেন, এবং তাহা অন্তরের গভীর বিশ্বাস হইতেই করিতেন। দাসপ্রথার কোনপ্রকার প্রসারণের বিরুদ্ধেই তাঁহারা তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। দক্ষিণ দেশ হইতে কোন দাস উত্তরাঞ্চলে পলাইয়া আসিলে তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য আইন প্রণয়নের বিরোধিতাও তাঁহারা করিতেন। দাসদিগকে তাহাদের দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা গুপ্ত-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহারা সীমান্ত অঞ্চলে সশস্ত্র লোক প্রেরণ করিলেন, যাহাতে ঐসব অঞ্চল স্বাধীন মানুষের বসবাসের উপযোগী হইয়া উঠে। তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসী, কোলাহলকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও দৃঢ়মনা সংখ্যালঘুর দল। তাঁহারা উচ্ছেদবাদী বলিয়া অভিহিত হইতেন। দাস-প্রথার নিন্দা করিতে গিয়া তাঁহারা সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁহাদের কাছে তাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বীর বলিয়া পূজিত হইতেন। দক্ষিণাঞ্চলের লোকদের কাছে তাঁহারা ছিলেন ভাবোন্মত্ত উগ্রপন্থীর দল, অন্যের ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেছেন। উচ্ছেদবাদীরা যখন দাসপ্রথার অন্যায় অবিচারের উপর কোন বই লিখিতেন, তখন দক্ষিণাঞ্চলের সংবাদপত্রসমূহ নিউ ইংলণ্ডের কারখানার শ্রমিকদের অল্প বেতন ও বেশী খাটুনির কথা উল্লেখ করিয়া প্রত্যুত্তর দিত। কথাগুলি সত্যই ছিল, কিন্তু তাহাতে বিবাদের

মীমাংসা হইত না। ক্রমশঃ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী বদ্ধমূল হইয়া গেল। যেসব দক্ষিণদেশবাসী দাসপ্রথায় বিশ্বাসী ছিল না, তাহারাও ভাবিতে লাগিল যে নিজেদের ব্যাপার সম্পর্কে মতস্থির করিবার অধিকার তাহাদের আছে, প্রয়োজন হইলে এই জন্য ইউনিয়ন ত্যাগ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইবে না। আবার, যেসব উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী উচ্ছেদবাদী ছিল না তাহারাও বলিতে লাগিল যে ইউনিয়ন রক্ষা করিতেই হইবে, প্রয়োজন হইলে গৃহযুদ্ধের দ্বারাও। ১৮৫৯ সালের ১৬ই অক্টোবর, জন ব্রাউন ও তাহার দল ভার্জিনিয়ার হারপারস্ ফেরীতে সশস্ত্র অভিযান করে। ইহাতে দাসেরা মুক্তিলাভ করিল না, কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসে জন ব্রাউনের দুর্ধর্ষ নাম অবিস্মরণীয় হইয়া রহিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভেদ আরও বৃহত্তর হইয়া গেল। দক্ষিণাঞ্চল-বাসীদের কাছে জন ব্রাউন ছিলেন একজন খুনী উগ্রপন্থী, যিনি দাসবিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন — তাহারা ইঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। উত্তরাঞ্চলে, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের কাছেও জন ব্রাউন ছিলেন একজন সাহসী বীর, যিনি স্বীয় আদর্শের জন্য শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ সালে পরবর্তী সভাপতি নির্বাচনে সাধারণতন্ত্রীদল প্রত্যেক স্বাধীন রাজ্যে জয়লাভ করিল। দক্ষিণাঞ্চলের ভোট তিনজন প্রার্থী ডগলাস্, ব্রেকেনরিজ ও বেল-এর মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। সাধারণ-তন্ত্রী প্রার্থী ইলিনয়েসের আব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন

ইলিনয়েসের এই আব্রাহাম লিঙ্কন কে?

১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কেণ্টাকীর এক কাঠের ঘরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা টমাস্ লিঙ্কন ছিলেন একজন দরিদ্র কিন্তু অমায়িক সীমান্তবাসী। মাতা ন্যান্সী হ্যাঙ্কস্ ছিলেন কোন রমণীর অবৈধ কন্যা।

রমণীটি তাঁহার সন্তানকে কোলে লইয়া বনের পথে ভার্জিনিয়া হইতে কেণ্টাকী আসিয়াছিলেন। খড়ের উপর চামড়ার বিছানায় তাঁহার জন্ম। ঘরটিতে ছিল একটিমাত্র দরজা ও একটি জানালা। আজ ওয়াশিংটনে 'লিঙ্কন-স্মৃতি সৌধ' নামে একটি বিরাট মার্বেল পাথরের প্রাসাদ আছে। প্রতিদিন সেখানে জনসাধারণের ভিড় হয় তাঁহার উপবিষ্ট প্রতিকৃতি দর্শনের উদ্দেশ্যে। তাঁহার মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাহারা নির্বাক হইয়া যায়, কারণ তাঁহার মুখাবয়ব কঠোর ও চিন্তামগ্ন হইলেও মহাপুরুষেরই প্রতিমূর্তি। আজ আমাদের ক্ষুদ্রতম তাম্রমুদ্রার উপর তাঁহার মুখ ও 'স্বাধীনতা' কথাটি অঙ্কিত আছে। তুইটি জিনিসই যথাযথ হইয়াছে — বিরাট প্রতিমূর্তি আর জনসাধারণের ব্যবহৃত ক্ষুদ্র মুদ্রা। কারণ, তিনি ছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তি, জীবনে ও মরণে সকল সময়েই যিনি জনসাধারণের কল্যাণার্থ কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে ভালবাসিতেন।

লিঙ্কন-পরিবার কয়েক পুরুষ ধরিয়াই আমেরিকায় ছিলেন। শক্ত, সবল, কর্মঠ, কলকারখানার মানুষ, পৃথিবীতে খুব উচ্চে তাঁহারা উঠেন নাই, খুব নীচেও নামেন নাই। লিঙ্কনের পিতামহ ছিলেন ভার্জিনিয়া গণবাহিনীর ক্যাপ্টেন। বিপ্লবের পর তিনি প্রথম দিকেই কেণ্টাকীতে চলিয়া আসেন, রেড-ইণ্ডিয়ানদের হাতে তিনি সেখানে নিহত হন। লিঙ্কনের মাতামহী পূর্বেই কেণ্টাকীতে আসিয়াছিলেন, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। তুই দিক হইতেই তাঁহারা ছিলেন অগ্রদূত, লিঙ্কনের শৈশবেও এই অগ্রগামী পরিবারের প্রভাব পড়িয়াছিল।

টম লিঙ্কন সস্ত্রীক ইণ্ডিয়ানায় চলিয়া আসেন, সঙ্গে তুইটি শিশু — আব্রাহাম ও তাহার বোন। তাঁহারা নিজেরাই জমি পরিষ্কার করিয়া কাঠের ঘর তৈরী করিলেন। সেখানে শুকনো পাতার বিছানায় তাঁহারা ঘুমাইতেন। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা নগ্নপদে থাকিতেন। পিতা শিকার করিতেন, কিছুটা চাষবাসও করিতেন — মা ঘর এবং ছেলেমেয়েদের

যত্ন করিতেন। আট বৎসর বয়সেই আব্রাহাম কুঠার চালাইতে শেখে। সে ও তাহার বোন প্রতিদিন নয় মাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি স্কুলে পড়িতে যাইত এবং আবার ফিরিয়া আসিত।

নয় বৎসর বয়সে তাহার মা মারা যান। তাহার পিতা পুনরায় বিবাহ করিলেন একজন সহৃদয়া চিন্তাশীলা মহিলাকে। তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভাই-বোন দুইটির যত্ন করিতেন। আব্রাহাম দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ পুরুষ হইয়া উঠিলেন — সুদক্ষ কাঠুরে ও প্রথমশ্রেণীর কুস্তিগীর। বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ধরণের কাজ তিনি করিতেন। কিন্তু সকল সময়েই তিনি পড়াশুনা ও চিন্তা করিতেন। ইণ্ডিয়ানা সীমান্তে বই খুব বেশী পাওয়া যাইত না। কিন্তু তিনি বই আনাইয়া সেইগুলি বারবার পড়িতেন। তিনি তাঁহার বন্ধুদের বলিতেন: "আমি যা জানতে চাই তা বইয়ে পাওয়া যায়। আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু সে — যে আমি পড়িনি এমন বই জোগাড় করে দিতে পারবে।" গভীর রাত্রে তিনি পড়িতেন চুল্লীর আগুনের সামনে। পড়িয়া তিনি ভাবিতেন, কী পড়িলেন।

তিনি গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি একজন চমৎকার গল্প-কথক ছিলেন। কেহ কেহ বলিত যে তিনি কাজের চেয়ে গল্প বলিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করিত যে তিনি যখন ইচ্ছা করিতেন তখন খুব কাজ করিতে পারিতেন। সারা-জীবনই তিনি জনসাধারণের কাছে গল্প বলিয়া গিয়াছেন — কখনও কোন একটা কথা বুঝাইবার জন্য, কখনও বা নেহাৎ কৌতুকের জন্যই। কিন্তু এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে একটা গভীর বেদনার ঢেউ বহিয়া যাইত। এই বেদনা যখন তাঁহাকে যন্ত্রণা দিত, তখন তাঁহাকে পৃথিবীর বিষণ্ণতম ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইত। হয়তো তিনি তাহাই ছিলেন।

তিনি এমন একটা-কিছু চাহিতেন যাহা তিনি নিজেও জানিতেন না।

একটা দোকান করিয়া তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ঋণ শোধ করিতে তাঁহার বহু বৎসর লাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি সমস্ত ঋণই শোধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আইন পড়িয়াছিলেন, তিনি নৌকার ম্যাঝি, সার্ভেয়ার ও পোষ্টমাষ্টারের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিতেন— দেখিলেন যে তিনি জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি ইলিনয়েস ব্যবস্থাপরিষদে নির্বাচিত হন। সেখানে তিনি রাজনীতি ও মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিলেন। তখনও তিনি অন্যকিছুর সন্ধান করিতেছিলেন, কিছু চাহিতেছিলেন। তিনি প্রেমে পড়িলেন; কিন্তু বিবাহের পূর্বেই মেয়েটি মারা গেল, যেমন তাঁহার মা মারা গিয়াছিলেন, মারা গিয়াছিল তাঁহার আঠারো বৎসরের বোন। মর্মান্তিক সঙ্গীতধারার মতোই তাঁহার জীবনে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। তাঁহার সুন্দর সুন্দর গল্প মৃত্যু রোধ করিতে পারিল না— দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় এই মৃত্যু।

আটাশ বৎসর বয়সে, মাত্র সাতটি ডলার পকেটে লইয়া তিনি ইলিনয়েসের স্প্রিংফিল্ডে আসিলেন আইনজীবীর ব্যাবসা সুরু করিবার জন্য। স্প্রিংফিল্ডে তখন দেড় হাজার লোকের বাস। ইহার চেয়েও বড় শহর লিঙ্কন দেখিয়াছিলেন—নৌকাতে কাজ করিবার সময় তিনি নিউঅর্লিন্স গিয়াছিলেন। কিন্তু যাই হোক, স্প্রিংফিল্ড শহরটি তাঁহার কাছে বড়ই মনে হইল।

স্প্রিংফিল্ডে তিনি বসতিস্থাপন করিলেন। মেরী টড্ নাম্নী একজন বিচক্ষণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও মেজাজী ভদ্রমহিলাকে তিনি বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের সন্তানাদি হইল। লিঙ্কন ছেলেমেয়েদের ভালবাসিতেন, যদিও তাহারা কখনও কখনও অফিসে আসিয়া কালি কলম ছড়াইয়া দিত। তিনি আইনজীবী হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেন এবং ব্যবসায়ে খুব হাতযশও হইল। জনসাধারণ তাঁহাকে সৎ ব্যক্তি বলিয়া জানিত, তাঁহাকে

সকলে 'সাধু এব্' বলিয়া ডাকিত। তাহারা জানিত যে ন্যায়পক্ষ ছাড়া তিনি কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। একবার তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি আর নির্বাচিত হন নাই। বন্ধুরা ভাবিলেন, 'কাজটা খারাপ হইল, খুবই খারাপ।' মনে হইত, তিনি যেন সেই মফঃস্বল শহরের আইনজীবী, একজন স্থানীয় ব্যক্তি ও গল্প-কথক হইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবেন। যাঁহার সম্বন্ধে লোকেরা বলিত: "তুমি নিশ্চয়ই এব্ লিঙ্কনের মুখে এ গল্পটা শুনেছো?" তিনি সব সময়েই তাঁহার মলিন কালো পোষাক পরিয়া ও যে জীর্ণ টুপির তলায় তিনি নথিপত্র রাখিতেন সেই টুপি মাথায় দিয়া স্প্রিংফিল্ডের রাস্তা দিয়া যাওয়া-আসা করিতেন। শহরের নূতন কাঁচা রাস্তা দিয়া নিজের ঘোড়ার গাড়ীটিতে করিয়া তিনি কখনও বিস্মিত, কখনও চিন্তান্বিত, কখনও বিষণ্ণ, কখনও জিজ্ঞাসুচিত্তে, কখনও বা হাসি ঠাট্টা করিতে করিতে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছিল অনেক। যাহারা তাঁহাকে খুব অল্পই চিনিত, তাহারাও তাঁহাকে 'এব্' বলিয়া ডাকিত। চল্লিশ বৎসর বয়সেই লোকে তাঁহাকে 'বুড়ো এব্' ডাকিতে আরম্ভ করে। তাঁহার স্ত্রী এবং ব্যাবসার অংশীদার তাঁহাকে 'মিঃ লিঙ্কন' বলিয়া ডাকিতেন।

১৮৫৪ সালের দিকে তিনি বিস্মিতভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতেছিলেন দাসপ্রথা সম্পর্কে, ইউনিয়নের অবস্থা সম্পর্কে। দাস-মনিবদের উপর ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কোন তীব্র ঘৃণা ছিল না। কিন্তু পিওরিয়াতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন: 'মানুষের স্বার্থপর বৃত্তির উপরই দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত—ইহার বিরোধিতা মানুষের ন্যায়বিচার হইতে উদ্ভূত।'

সেই সময়ের মতো তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। ১৮৫৮ সালে জাতির শ্রেষ্ঠ বাগ্মী স্টীফেন, এ, ডগলাস-এর বিরুদ্ধে সেনেটে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়া তিনি 'বিভক্ত পরিবার' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। লিঙ্কন ও ডগলাস এই

বিষয়ে বিতর্ক করিয়া সমস্ত রাজ্যে বক্তৃতা দিলেন — সরলচিত্ত মফঃস্বল-শহরের এই আইনজীবী এমন একজন বক্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন যাঁহাকে দেশবাসী 'ক্ষুদে দানব' বলিত। ডগলাস নির্বাচনে জিতিয়া সেনেটে গেলেন। কিন্তু লিঙ্কনের কথাগুলি দেশবাসীর হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করিল: "আমি নিগ্রোদের জন্য কেবলমাত্র এই চাই, যদি আপনারা তাহাদের পছন্দ না করেন, তাহাদের একা থাকিতে দিন। যদি ভগবান অল্প দিয়া থাকেন, সেই অল্পটুকুই তাহাদের ভোগ করিতে দিন।"

"স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসাই আমাদের নির্ভর। ভগবান আমাদের বুকে এই স্পৃহা রোপণ করিয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র সকল দেশে যেখানে মানুষ স্বাধীনতাকে ঐতিহ্য বলিয়া শ্রদ্ধা করে, সেই চিন্তাধারাকে রক্ষা করাই আমাদের আত্মরক্ষা। ইহাকে ধ্বংস করার অর্থ নিজেদের দুয়ারের চার পাশে স্বৈরাচারের বীজ বপন করা। দাসত্বের শৃঙ্খলের সহিত পরিচিত হউন। দেখিবেন, আপনি নিজেই তাহা অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।"

"দুই মতবাদের এই সংঘর্ষ চিরন্তন। একটি সকল মানুষের সাধারণ অধিকার, দ্বিতীয়টি নৃপতির স্বর্গীয় অধিকার। এই ভাবধারা হইতেই বলা হইয়া থাকে 'তুমি শ্রম করিয়া রোজগার করো, আমি তাহা ভোগ করিব। যে ভাবেই ইহা কার্যকরী হউক না কেন,··· ইহা স্বৈরাচারীর নীতি।'"

তাঁহার কথাবার্তায় শ্লেষ ও রসবোধ ছিল। যদি কোন অন্ধকার রাত্রে কেহ আলো জ্বালাইয়া তাঁহার মুখ দেখিতে চাহিত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, 'বন্ধুগণ, আমার চেহারা যত কম দেখবেন, ততই আমাকে পছন্দ করবেন বেশী।' কোন বিত্তশালী ব্যক্তির জাঁকজমকপূর্ণ শবযাত্রা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খবর শুনিলে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন, 'যদি জেনারেল 'অমুক' জানিতে পারিতেন মৃত্যুর পর কী বিরাট আয়োজনে তাঁহার

অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হইবে, তাহা হইলে বহু বৎসর আগেই তিনি মারা যাইতেন।' কিন্তু তাঁহার অন্যান্য কথাগুলি জনগণের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। মানুষ স্বাধীন, তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। দাসপ্রথা অন্যায়। গণতন্ত্র বাস্তব, ইহার ভিত্তিতে মানুষ জীবনযাপন করিতে পারে। এই বিশ্বাস লইয়াই অবশেষে নূতন সাধারণতন্ত্রী দল নিজেদের নীতি ঘোষণা করিল, সীমান্ত অঞ্চলের কতকগুলি নীতি, পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের জন্য জমিদান, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। এই নীতি ঘোষণা করিয়া তাহারা একটি অধিবেশনে আব্রাহাম লিঙ্কনকে তাহাদের দলের পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী নির্বাচন করিল। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া তিনি তাঁহার বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিলেন। নিজেই বিছানাপত্র তোরঙ্গ বাঁধিয়া তাহার উপর ঠিকানা লিখিলেন 'এ, লিঙ্কন, হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন, ডি, সি,'। স্প্রিংফিল্ডে তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের নিকট হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র একান্ন। তিনি বলিলেন:

"বন্ধুগণ, পঁচিশ বছরেরও বেশী আমি আপনাদের সহিত বাস করিয়াছি··· আমার যৌবনকাল হইতেই এখানে বাস করিতেছি, আজ আমি বৃদ্ধ··· এইখানে আমার সকল সন্তানের জন্ম, তাহাদের মধ্যে একজন এখানেই কবরে শায়িত···আজ আপনাদের ছাড়িয়া যাইতেছি এমন একটি কর্তব্য গ্রহণ করিতে যাহা জেনারেল ওয়াশিংটনের কার্যভার হইতেও দুরূহ। তাঁহাকে যে মহান ভগবান সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি যদি আমার সহিত না থাকেন তাহা হইলে আমি ব্যর্থ হইব। ···আসুন, আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের পরমপিতা ঈশ্বর যেন এখন আমাদের পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার হস্তেই আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি···এই কথাগুলি বলিয়াই আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি, কতকালের জন্য তাহা জানি না।"

ইহার পর কী ঘটিল?

গৃহযুদ্ধ

দক্ষিণদেশের লোকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে তাহারা সাধারণতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট স্বীকার করিবে না। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা ১৮৬০ সালের ২০শে ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার দুই মাসের মধ্যেই আলাবামা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, লুইসিয়ানা এবং জর্জিয়া অনুরূপ আচরণ করিল। ১৮৬১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ছয়টি রাষ্ট্রত্যাগী দেশের প্রতিনিধি আলাবামার মণ্টোগোমেরীতে মিলিত হইয়া 'কনফেডারেট স্টেট্স্ অব আমেরিকা' গঠন করিল। দুই সপ্তাহ পর টেক্সাসও এই দলে যোগদান করিল। লিঙ্কন ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করিলেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি সরল অথচ দৃঢ় ভাষায় তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন: "গৃহযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান আপনাদের হাতেই আছে, আমার হাতে নহে। সরকার আপনাদের উপর জবরদস্তি করিবে না···কিন্তু আমি মনে করি, সার্বভৌম আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী এই রাষ্ট্রগুলির ঐক্য চিরস্থায়ী···কোন রাজ্য ইচ্ছা করিলেই আইনানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন হইতে সরিয়া যাইতে পারে না···"

ইহার এক মাসেরও সামান্য কয়েকদিন পরে গৃহযুদ্ধের প্রথম গুলী ছোঁড়া হয়। আরও চারটি দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য ভার্জিনিয়া, আরকানসাস্, টেনেসি এবং উত্তর ক্যারোলাইনা কনফেডারেশনে যোগ দিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দীর্ঘ চার বৎসর যুদ্ধ চলিল। পরম সাহসিকতা ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুদ্ধ চলিল। দক্ষিণদেশের যাহারা মৃত্যুবরণ করিল, তাহারা ভাবিল তাহাদের পিতৃপিতামহ অর্জিত স্বাধীনতার জন্যই তাহারা প্রাণ বলি দিতেছে। উত্তরাঞ্চলের যাহারা প্রাণ বিসর্জন দিল, তাহারা ভাবিল তাহাদের পূর্বপুরুষকৃত ইউনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তাহারা

মৃত্যুবরণ করিতে চলিয়াছে। সর্বসমেত এই গৃহযুদ্ধে ব্যাধি, আঘাত ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিহতের সংখ্যা ছিল ৬,১০,০০০ জন।

কয়েকটি স্মরণীয় যুদ্ধের নাম করা যাইতে পারে। বুলরান্, চ্যান্সেলরস্-ভাইল, এণ্টিয়েটাম্, ভিকস্‌বার্গ, গেটিস্‌বার্গ, চিকামোগা। কিন্তু তাহার দ্বারা ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। এই ইতিহাসের কাহিনী অঙ্কিত ছিল নরনারীর হৃদয়ে—দক্ষিণদেশের সাহসী ও নম্রস্বভাব সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ই, লী-র মতো মানুষের অন্তরে। লী-কে তাঁহার দেশবাসী ও সৈন্য-বাহিনী গভীর শ্রদ্ধা করিত। পরম রণকৌশলে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন, বীরোচিত সাহসের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বিধ্বস্ত মাতৃভূমিকে ন্যায়বিচার ও শান্তির দিকে লইয়া যাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই ইতিহাস রচিত প্রফুল্লচিত্ত দক্ষিণী বাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণ ও ইউনিয়ন বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মধ্যে, যাহার ফলে গেটিসবার্গে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। এই কাহিনী গাঁথা ছিল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মনে—ইতিহাসে যাহারা অজ্ঞাত, অথচ যাহারা আদর্শ বিশ্বাসের জন্য দুই দলেই নির্ভীকভাবে দুঃখবরণ করিয়া সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল। গেটিস্‌বার্গে নিহত সৈন্যদের সমাধি উৎসর্গের সময় লিঙ্কন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখযোগ্য: "সাতাশী বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই মহাদেশে একটি নূতন জাতি লইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহারা স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিয়া এই ঘোষণায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, সকল মানুষই সমান।

"আজ এই বিরাট গৃহযুদ্ধে আমরা সেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছি যে, সেই জাতি অথবা কোন জাতি এই আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দীর্ঘকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারে কিনা। এই যুদ্ধের একটি বিরাট সংগ্রামের ক্ষেত্রে আজ আমরা মিলিত হইয়াছি; এই সংগ্রাম-ক্ষেত্রের

একটি অংশ আজ সেই বীরপুরুষদের চিরনিদ্রার শয্যারূপে উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি যাঁহারা জাতির দীর্ঘজীবনের জন্য এইখানে আপন আপন জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। ইহা আমাদের অতি অবশ্য করণীয় কার্য।

"কিন্তু বৃহত্তর অর্থে আমরা এই জমিকে উৎসর্গ এবং পবিত্র করিতে পারি না। কারণ, জীবিত ও মৃত সাহসী ব্যক্তিরা নিজেদের সংগ্রামের দ্বারা এই মাটিকে পবিত্র করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি এই পবিত্রতা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। আজ আমরা এইখানে যাহা বলিব, পৃথিবী তাহা অল্পই শুনিবে, দীর্ঘকাল স্মরণও রাখিবে না। কিন্তু তাঁহারা এইখানে যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কোনদিন বিস্মৃত হইবার নয়। আমরা যাহারা বাঁচিয়া আছি, তাহাদেরই উচিত এই অসমাপ্ত কার্যে নিজেদের উৎসর্গ করা, যে-কার্যের অনেকখানি তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া আগাইয়া দিয়াছেন। যে বিরাট কর্তব্য আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহার জন্য আমাদের নিজেদিগকে উৎসর্গ করিতে হইবে, মৃত বীরেরা যে কার্যের প্রতি শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতেই আমাদের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে যে, তাঁহাদের জীবনদান ব্যর্থ হয় নাই, এই জাতি ভগবানের আশীর্বাদে স্বাধীনতার নবজন্ম লাভ করিবে, এবং আমাদের প্রতিষ্ঠিত জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা চালিত, জনগণের সরকার পৃথিবীর বুক হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না।"

দ্বিতীয় উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য :

"কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না রাখিয়া, সকলের প্রতি দয়া দেখাইয়া এবং ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতায় ন্যায়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করিতে চেষ্টা করিব; জাতির ক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ দিব; যাহারা জাতির জন্য যুদ্ধে লিপ্ত তাহাদের যত্ন লইব, তাঁহাদের বিধবা পত্নী ও অনাথ সন্তানদের ভার গ্রহণ করিব — আমাদের নিজেদের

মধ্যে এবং পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া কাজ করিয়া যাইব।”

এই কথাগুলির মধ্যেই আমেরিকার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে এবং এই মনোভাব লইয়াই আব্রাহাম লিঙ্কন যুদ্ধে নামিয়াছিলেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইলে তাহাও তিনি এই মনোভাব হইতেই করিতেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ সমাপ্তির দশ দিন পর ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল ঘাতকের গুলীতে তিনি আহত হন এবং তার পরদিন প্রাণত্যাগ করেন।

পুনর্গঠন

জাতির সম্মুখে এখন নূতন কর্তব্য দেখা দিল — জাতির পুনর্গঠন, পুনঃসংস্কার এবং পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করিবার কর্তব্য।

১৮৬২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর লিঙ্কন দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাসদের মুক্তি দেন। সেইদিন এক ঘোষণাপত্রে তিনি এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহরত সমস্ত রাজ্যে ও জেলায় যত ক্রীতদাস আছে তাহারা ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে অতঃপর চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে। ১৮৬৫ এবং ১৮৬৮ সালে সংবিধানে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংশোধন যুক্ত হইল যে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ও তাহার অধীন কোন এলাকায় দাসত্ব অথবা বাধ্যতামূলক শ্রমপ্রথা থাকিতে পারিবে না।’ এবং ‘যুক্তরাষ্ট্রের সীমানায় অথবা তাহার কর্তৃত্বাধীন কোন এলাকায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অথবা স্থায়ী বসবাসের অধিকার লাভ করিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তিকেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে। কোন রাজ্যই এমন কোন আইন প্রণয়ন কিংবা জারী করিতে পারিবে না যাহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সুযোগ এবং সুবিধা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কোন রাজ্য কোন ব্যক্তিকে জীবনধারণ, স্বাধীনতা অথবা সম্পত্তি

রক্ষার অধিকার হইতে অবৈধভাবে বঞ্চিত করিতে পারিবে না···' যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হইল। রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগ ও বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনাও দূর হইল। চার বৎসরব্যাপী যুদ্ধ এই দুইটি প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিল। ১৭৭৬ সালে যে জাতির জন্মলাভ, ১৮৬৫ সালেই তাহা অচ্ছেদ্য এক জাতিতে পরিণত হইল।

কিন্তু আরও বহু সমস্যা রহিয়া গেল। ক্রীতদাসেরা অকস্মাৎ মুক্তিলাভ করিয়া নাগরিক অধিকার লাভ করিল, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাহারা অবহিত ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলের পুরাতন চাষবাসের প্রথা বিধ্বস্ত হইয়া গেল, এই দীর্ঘকালের যুদ্ধে তাহারা দরিদ্রও হইয়া গেল। দক্ষিণদেশের শ্বেতাঙ্গ নেতৃবর্গের অনেকেই যুদ্ধে মারা গিয়াছিলেন। অন্যেরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেও সে-রাষ্ট্রকে তখনও শত্রু বলিয়াই মনে করিত।

লিঙ্কন যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যে পুনর্গঠনের সমস্যা এবং দক্ষিণদেশের রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির সমস্যাকে আরও বিচক্ষণতা এবং সহৃদয়তার সহিত কার্যকরী করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্তে দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যাকে অনেক প্রতিশোধকামী ব্যক্তি রূঢ়ভাবে সমাধান করিতে অগ্রসর হইল। তাহারা জাতিকে মহত্তর করিয়া তুলিবার পরিবর্তে দক্ষিণদেশকে শাস্তিপ্রদান করিতেই বেশী বদ্ধপরিকর ছিল।

কিন্তু মার্কিণীদের পক্ষে গৌরবজনক একটা কথা এখানে বলা যাইতে পারে। আর কোন রক্তপাত হইল না। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইল না। নরমুণ্ড আর গড়াগড়ি গেল না।

যে মুষ্টিমেয় উন্মাদ লিঙ্কন এবং অন্যান্য সরকারী নেতৃবর্গের হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহাদিগকে ফাঁসী দেওয়া হয়। তাঁহার

প্রকৃত হত্যাকারীকে বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। যে আধ-পাগলা অফিসার দক্ষিণদেশীয় বন্দী শিবিরের অধিকর্তা ছিল, তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হইল। কনফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট জেফারসন ডেভিস এবং তাঁহার কতিপয় সহযোগীকে কিছুকালের জন্য বন্দী রাখার পর মুক্তি দেওয়া হয়। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করা হয় নাই।

দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত নেতৃবর্গ ও সেনাধ্যক্ষ — লী, জনসন, স্টিফেন্স, হ্যাম্পটন, লংস্ট্রীট্ — কাহাকেও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযুক্ত করা হয় নাই।

পরাজয়ের মধ্যে লী যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দক্ষিণদেশবাসীর পক্ষে আদর্শস্বরূপ ছিল। লী ইচ্ছা করিলে তাঁহার সুনাম ও খ্যাতি ব্যাবসাকার্যে ব্যবহার করিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে পারিতেন, প্রত্যেক দক্ষিণাঞ্চল-বাসীই এই বই ক্রয় করিত, এই জন্য তাহারা অনশন করিতেও রাজী ছিল। কিন্তু তাহা হইলে তিনি সত্যিকারের যে মানুষ ছিলেন, তাহার পরিচয় দিতেন না। আজীবন শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসী লী একটি ক্ষুদ্র দক্ষিণদেশীয় কলেজের সভাপতি-পদ গ্রহণ করিলেন এবং পরম ধৈর্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে সেই কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কাজ করিবার সময়ে কলেজটির নাম ছিল ওয়াশিংটন কলেজ। বর্তমানে ইহা ওয়াশিংটন ও লী নামে অভিহিত।

বিদ্বেষ ও শত্রুতা রহিয়া গেল। অন্যায়, অবিচারও হইতে লাগিল। কিছুকালের জন্য দক্ষিণাঞ্চল সামরিক শাসনাধীন ছিল। কনফেডারেশনের প্রাক্তন সৈন্যরা নির্যাতিত হইতে লাগিল। নিগ্রোরা অকস্মাৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও অত্যাচারিত হইল। উভয় পক্ষের বদমায়েসদের তাহারা শিকার হইল। অকস্মাৎ ভোটাধিকার লাভ করিয়া তাহারা স্বায়ত্ত-

শাসনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ব্যতীতই রাজ্য সরকার গঠনের সহায়তার জন্য আহূত হইল। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে এই সময়কার সরকার ছিল দুর্নীতিপরায়ণ, অযোগ্য এবং অপব্যয়ী। তাহারা অনেক মূল্যবান প্রগতিবাদী আইন পাশ করিয়াছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী, লোভী ও কুচক্রী কোন কোন শ্বেতাঙ্গেরা নিগ্রো পরিষদ-সদস্যদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাইত, আর দায়িত্বশীল শ্বেতাঙ্গদের নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য করা হইত। এই সমস্যাটাকে কেহই তখন গভীরভাবে তলাইয়া দেখে নাই। কিন্তু এইরূপ অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না এবং ১৮৭৭ সালের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের সরকার পুনরায় শ্বেতাঙ্গদের করতলগত হয়।

তবুও নিগ্রোরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগকে পুনরায় দাস করিবার কোন উপায় ছিল না। দক্ষিণাঞ্চল যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল, পরাজয়ের ফলে তাহারা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারা পুনরায় ইউনিয়নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। যাহারা কনফেডারেশনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রতিনিধি, সেনেটর ও রাজ্যসমূহের গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। তেত্রিশ বৎসর পর স্পেন-মার্কিণ যুদ্ধে ফিৎসহিউ লী এবং অন্যান্য কনফেডারেশনপন্থী সৈনিকেরা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবিভাগে আনুগত্য ও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সেই প্রথম দিকেই একজন শ্রেষ্ঠ দক্ষিণদেশীয় বাগ্মী বলিয়াছিলেন: "এইরূপ বিরাট ধ্বংস যেমন আর আসে নাই, এইরূপ দ্রুত পুনর্গঠনকার্যও আর হয় নাই। সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখা হইতে বাহির হইয়াই শস্যক্ষেত্রে যোগদান করিল··· এপ্রিলে যে-জমি মানুষের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল, জুনে সে-জমি ফসলে সবুজ হইয়া উঠিল।"

জাতি একটা রূঢ় ও বিরাট আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু সেই ক্ষত তাহারা বন্ধ করিয়াছিল। পুনঃসংস্কারকার্যের সমস্ত ত্রুটি, বিচ্যুতি এবং দোষ সত্ত্বেও একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি অগ্রসর হইয়া চলিল।

তামা ও সীসার যুগ

জাতি অগ্রসর হইল — কিন্তু কোথায়?

এই প্রশ্ন বহু বিদ্বান ও জ্ঞানী মার্কিণী ও ইউরোপীয় করিয়াছেন। আমেরিকার ইতিহাসে অবিরত এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। আজও পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।

তোমরা কোথায় চলিয়াছ? তোমাদের উদ্দেশ্য কী? তোমরা যে কাজ করিতেছ তাহার কারণ কী এবং পরিণামে তোমরা কী করিতে চাও?

আমেরিকাবাসী একটা চল্‌তি-কথায় ইহার জবাব দেয়: "কোথায় চলিয়াছি জানিনা, কিন্তু আমরা আমাদের পথেই চলিয়াছি।" কথাটায় কিছু সত্য নিহিত আছে, যদিও তাহা অর্ধসত্য। মার্কিণীরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, একটা কিছু তাহারা করিবেই, যদি তাহা ভুলও হয়, তবুও। তাহারা ভুল জায়গায় বহু কষ্ট সহ্য করিয়া একটা কিছু গড়িয়া তুলিবে, প্রয়োজন হইলে আবার কষ্ট করিয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিবে, তবুও উহা তৈয়ার না করিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে চিন্তাশীল দার্শনিক আছেন, কিন্তু তাহারা মোটের উপর চিন্তাশীল জাতি নয়। তাহারা কাজ করিতে চায়। তাড়াতাড়ি করিয়া কোন কিছু শেষ করিয়া পরবর্তী কাজে তাহারা হাত দেয়। যখন কোন কিছুই করণীয় থাকেনা তখনই তাহাদের অবস্থা হয় শোচনীয়। সেইজন্য গত মন্দার যুগে তাহারা খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। আমেরিকার এই প্রথম মনে হইল যে কোন কিছুই অগ্রসর হইতেছে না। অতীতের কোন ভুলভ্রান্তি পরিশোধ করিবার জন্য তাহারা সর্বদাই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকে। এই জন্যই তাহারা বিপদে পড়ে, ইহাই তাহাদের শক্তি, ইহাই তাহাদের দুর্বলতা। তাহারা তরল, স্থির নয়। সকল সময়েই তাহারা জানিতে ও চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক। যদি তাহাদিগকে অকস্মাৎ কোন একটা

পরিপূর্ণ স্বর্ণ-মণ্ডিত পাথিব স্বর্গও দেওয়া হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার উন্নতিসাধনকার্যে নিযুক্ত হইবে।

আমেরিকার আদর্শের স্বপ্ন ছিল বহুবিধ—সীমান্তের সংগ্রামী স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠাতাদের প্লুটার্কীয় স্বাধীন সাধারণতন্ত্র, জেফারসনের কৃষি-সাধারণতন্ত্রের স্বপ্ন, অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনের সীমান্তের গণতন্ত্র এবং লিঙ্কনের গণতন্ত্র, যিনি বলিয়াছিলেন: "যেমন আমি দাস হইতে চাই না, তেমনি আমি প্রভুও হইতে চাই না। গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার ধারণা এই"; লী-র মতো ব্যক্তিরা নিঃস্বার্থ সম্মান ও কর্তব্যনিষ্ঠায় অভিজাত ও প্রাচুর্যময় শাসন-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তাহাদের রীতি অনুযায়ী সাধারণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই একটা শাসনতন্ত্র, দক্ষিণদেশের চাষবাসের ব্যবস্থাই তাহাকে বলা যাইতে পারে। নিউ ইংলণ্ডের পিউরিটান-পন্থীদের সাধারণ জীবনযাত্রা ও উচ্চচিন্তার স্বপ্ন, হাজারো রকমের স্বপ্ন যাহা এক একবার উদিত হইয়া আবার মিলাইয়া গিয়াছিল, নব্যপন্থী ইহুদী, নূতন সমন্বয়পন্থী প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মপন্থারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছিল। আমেরিকার কোন না কোন অংশে সম্ভাব্য সকল রকম জীবনযাত্রার ধারাই জনসাধারণ নিজেদের ইচ্ছামত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে—সাম্যবাদ, সমাজবাদ, বহুবিবাহ, চিরকৌমার্য, পরিকল্পিত প্রজননবিদ্যা, ধর্মগুরুর শাসন, জ্যেষ্ঠদের শাসন, আত্মিক শক্তির পরিচালনা, সমস্তই। যতদিন পর্যন্ত এই সব পরীক্ষাকার্য জাতির জীবনযাত্রায় অথবা প্রতিবেশীর জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করিত, ততদিন পর্যন্ত সেইগুলিকে কেহ বাধা দিত না। এই সমস্তের জন্যই প্রশস্ত স্থান ছিল।

যাহাই হোক, গৃহযুদ্ধের অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী পর পর্যন্ত মার্কিণ জীবনের স্বপ্ন তিনটি বিষয়ের উপরেই কেন্দ্র করিয়া ছিল—কর্ম, বৃদ্ধি ও অর্থ।

কাজ করা পুণ্যক্রিয়া বলিয়া বিবেচিত হইত—কাজই ছিল একটা মহৎ গুণ। অর্থার্জন করাও পুণ্যকর্ম ছিল—যাহারা অর্থার্জন করিত,

তাহারা বিত্তবান ছিল বলিয়াই সম্মানলাভ করিত। কোন কিছু বৃহৎ কার্য করা, কাজ এবং অর্থের পরিপ্রেক্ষায় কোন মহৎ কিছু গড়িয়া তোলাই মহৎগুণ বলিয়া গণ্য হইত। বিরাট আকারই ছিল একটা গুণবিশেষ।

যাহারা কাজ করিত না এবং অর্থার্জনও করিত না তাহারা ছিল অলস, কুঁড়ে এবং জড়প্রকৃতির লোক। তাহাদিগকে কেহ সম্মান করিত না, যদি না তাহারা দেখাইতে পারিত, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা আকারে বড়, অভিনব এবং বাজারে তাহার মূল্য আছে। এডিসনের মতো আবিষ্কারক অত্যন্ত সম্মান লাভ করিতেন। তিনি বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহা সুইচ টিপিয়া জ্বালানো এবং নিবানো যাইত। কিন্তু উইলার্ড গিব্‌স্‌-এর ন্যায় গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিদের নামও সকলে জানিত না। প্রত্যেক জিনিসের মূল্য যাচাই হইত "ইহার দ্বারা কাজ হইবে কী? হইলে কতটুকু হইবে?" এই ভিত্তিতে।

এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কর্মপ্রেরণার ফলে ভোগ ব্যবহারের উপযোগী বহু বিরাট জিনিস এবং বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী হইল। দুর্লংঘ্য পর্বত ও দুস্তর মরুভূমির উপর দিয়া আন্তঃমহাদেশীয় রেলপথ স্থাপন করা হইল; মনে হইল এই রেল কোন মানুষ পরিচালনা করিত না, পরিচালনা করিত দৈত্য দানবেরা। যেস্থানে পূর্বে শহর ছিলনা সেখানে নগর গড়িয়া উঠিয়া প্রসার লাভ করিতে লাগিল। তক্তার জন্য বন-কে-বন কাটিয়া কাঠ নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল করাতের কলের তাগিদে। মাটির তলা হইতে লোহা, সীসা, সোনা, তেল, টিন, রূপা সমস্ত খুঁড়িয়া বাহির করা হইতে লাগিল যেন লক্ষ লক্ষ হাতে। সারা রাত ধরিয়া বিরাটকায় চিমনী ও ফার্নেস জ্বলিতে লাগিল। ১৯০০ সালের মধ্যেই আমেরিকার ফার্নেস যে ইস্পাত উৎপাদন করিল তাহা গ্রেটবৃটেন ও জার্মানীর একত্রে উৎপন্ন পদার্থের সমান। ইহার সঙ্গে

সঙ্গে সমান তালে চলিতে লাগিল আবিক্রিয়া, যান্ত্রিক উন্নতিবিধান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো, অতলান্তিক তারবার্তা, যান্ত্রিক শস্যবপনপ্রথা, শস্যকাটার যন্ত্র, ধানভানার যন্ত্র, স্টীলের লাঙ্গল প্রভৃতি সকল-ই।

এই সমস্তই মার্কিণীদের আবিষ্কার ছিল না, কিন্তু যে কোন নূতন আবিষ্কারকেই মার্কিণীরা গ্রহণ করিত এবং তাহাকে উন্নত করিয়া নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিত। ওমাহা নগরীর যে কোন জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া একটি সেফ্‌টিপিন পর্যন্ত সব কিছুকেই তাহারা স্বর্ণপাত্রের সমান মূল্যবান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। তেল, রেলপথ, খনি, যন্ত্রপাতি এবং নূতন আবিক্রিয়া — এইগুলিই মানুষকে ধনবান করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে অর্থনাশ ও মন্দা আসিত, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না — আবার আমাদের অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। একবার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়াছে, আর একবার চেষ্টা কর—এই ছিল মার্কিণ মত। যদি অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগী তাঁহার স্টীল কোম্পানী হইতে চার হাজার লক্ষ ডলার উপার্জন করিতে পারেন, তাঁহাকে কি নিন্দা করিবে! ইহাই প্রমাণ করে একজন দরিদ্র ও পরিশ্রমী বালক কী-না করিতে পারে। একজন প্রকৃত মার্কিণী হইতে হইলে আপনাকে একটি টেলিফোন, একটি বৈদ্যুতিক আলো এবং একটি গাড়ী কিনিতে হইবে। যদি আপনি তাহা না চান, তাহা হইলে ভাই, সরিয়া পড়ুন, কারণ আরও বহু লোক আছেন যাঁহারা এই সব আশা করেন। আজিকার দিনটা আমি খুব ব্যস্ত, ব্যস্ত পথের উপর কোন ঘাস জন্মায় না, আমি আমার স্বাস্থ্যরক্ষার কার্যে ব্যস্ত নই। নূতন অপেরা গৃহ, নূতন মিল, নূতন কোটিপতি, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন জেলখানা এবং নূতন উদ্যানটির দিকে তাকান — এই সবগুলিই আমাদের পূর্বতনগুলির চেয়ে বৃহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর। যদি আমাদের এইগুলি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে

এইগুলি ভাঙিয়া দিয়া আরো বৃহৎ এবং আরো সুন্দর জিনিস তৈয়ার করিব। আমরা ব্যস্ত, আমরা চলমান, আমরা উন্নতি করিয়া চলিয়াছি, আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, আমরা কোথায় চলিয়াছি জানি না, কিন্তু আমরা আমাদের পথেই চলিয়াছি।

অবশ্য ইহা সবটাই সত্য ছিল না—সকল মার্কিণীদের পক্ষেই সম্পূর্ণ সত্য ছিল না। কিন্তু ইহাই ছিল যুগ-মানস। তবুও এই যুগেও বহু লোক সৎভাবে, শান্তভাবে ও নিভৃতে জীবনযাপন করিতেন। তাঁহারা পূজা করিতেন ঈশ্বরকে, অর্থকে নহে। এই যুগেও নবীন ও প্রাচীন বহু মার্কিণদেশবাসীর শক্তিশালী প্রতিবাদীকণ্ঠ শোনা গিয়াছে: "ইহা আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে। আমরা অর্থ ও সাফল্যের চেয়েও মহত্তর ও অধিকতর স্থায়ী কিছু চাই।" এই প্রতিবাদ-কণ্ঠ দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টের প্রপৌত্র চার্লস ফ্রান্সিস্ অ্যাডাম্স হইতে সুরু করিয়া ইলিনয়েসের গভর্ণর জন, পি, আল্টগেল্ড পর্যন্ত শোনা গিয়াছে। আল্টগেল্ড জনসাধারণের অধিকার রক্ষার দাবীতে ফেডারেল সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও শক্তিশালী পুলম্যান কোম্পানীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আঘাত হানিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি ঘৃণিত ও অপমানিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কর্মবন্যা, এই গর্জন, এই নির্মাণকার্য, এই অর্থ, এই উচ্চকণ্ঠের চিৎকার সমস্ত সময়কে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিল। এমন কি মার্ক টোয়েনের মতো চমৎকার মানবিকতা-বোধসম্পন্ন সাহিত্যিক যিনি অবিচার, অত্যাচার এবং শ্রেণী-বৈষম্যকে ঘৃণা করিতেন তিনিও একটা টাইপ মেসিন তৈরীর ব্যাপারে তাঁহার জীবনের বহু সময় এবং অর্থ অপব্যয় করিয়াছিলেন। কেন? কেবলমাত্র সাহিত্যিক হওয়াই যথেষ্ট ছিল না—মার্কিণী হিসাবে যন্ত্রের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক একটা অনুরাগ ছিল। যদি তিনি মেসিন তৈরীতে সফল হইতেন তিনি ক্লার্ক, টেবর কিংবা অন্য যে-কোন একজন কোটিপতির ন্যায়ই প্রথমে দুঃখকষ্ট করিয়া পরে প্রভূত অর্থলাভ করিতে পারিতেন।

ইউরোপ একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিল — মার্কিনী কোটিপতি। তিনি প্রচুর অর্থ লইয়া ইউরোপে আসিতেন, সিগার টানিতে টানিতে দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কপর্দকশূন্য ডিউক কিংবা প্রিন্সের সঙ্গে নিজের কন্যাদের বিবাহও দিয়া যাইতেন। তিনি ক্রয় করিতেন নানারূপ চিত্রিত পরদা, ছবি, পাথরের মূর্তি, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, প্রাসাদের পর প্রাসাদ, নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম সব-ই — কিন্তু এসবই তিনি ক্রয় করিতেন। তিনি নানান ধরণের লোকদের সাহায্য করিতেন, শিল্প-ব্যবসায়ী, উপাধিবিশিষ্ট দেউলিয়া লোক, জোচ্চোর কিংবা সত্যিকারের শিল্পীদের। তাঁহাকে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিত — কিন্তু তিনি নগদ টাকা দিতেন। তাঁহাকে যত বোকা কিংবা শিশুসুলভ মনে হইত সব সময়েই তিনি তা ছিলেন না — তিনি আসলে একজন কর্মব্যস্ত লোক, যিনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন এবং কী করিয়া সেই অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা ঠিক জানেন না, কিন্তু তাঁহার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, সভ্যতার নিদর্শন কিনিবার মতো জিনিস, যদি অবশ্য একটা পকেট-বুক থাকে সঙ্গে। কোন কোন সময় জে, পি, মর্গ্যানের মতো তিনিও বেশ ভালভাবেই জানিতেন, তিনি কি কিনিতেছেন, আবার কোন কোন সময় তাঁহার খেয়ালই থাকিত না। অনেক সময় তিনি প্রতারিত হইতেন এবং বোকা বনিয়া যাইতেন। কিন্তু, অবশেষে, তিনি যাহা কিনিতেন তাহার সবই আমেরিকায় চলিয়া আসিত এবং তাহাও অবশেষে জনসাধারণের আনন্দ ও উপকারেই লাগিত।

এইভাবে 'কঠিন পরিশ্রম ও অর্থার্জন' এই মার্কিণ ভাবধারা বিস্ময়কর-ভাবে প্রসার লাভ করিতে থাকে। যাঁহারা বিরাট অর্থের মালিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ভাবিলেন যে, এই অর্থও যথেষ্ট নহে। সারাজীবন কর্মব্যস্ততার মধ্যে যাপন করিয়া বিরাট সম্পদের অধিকারী হইলেও তাঁহারা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, কারণ

কর্মবিহীন সময় উপভোগ তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অর্থই তাঁহাদিগকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিত, কারণ, আর কিছু না হোক, ইহা তাঁহারা জানিতেন যে অর্থই শক্তি। দরিদ্র ঘরে সাধারণ নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের জন্ম। যদি তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে নিজেদের কন্যা বিবাহ দিয়া ইউরোপীয় খেতাব অর্জন করিতে পারিতেন, কারণ কিনিবার মতো কোন মার্কিণ খেতাব তখন ছিল না। যাহাই হোক, এই অর্থ দিয়া আরও কিছু করা তখন অপরিহার্য ছিল।

তাই আমরা দেখিতে পাই, অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগীর মতো ব্যক্তি তাঁহার চার হাজার লক্ষ টাকার অধিকাংশই ব্যয় করিয়াছেন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য—যাহারা তাঁহার মতোই পড়িবার বই যোগাড় করিতে পারে না, তাহাদের জন্য—অবৈতনিক সাধারণ গ্রন্থাগার নির্মাণে। জন, ডি, রকফেলার-এর মতো ব্যক্তিকে আমরা দেখিয়াছি—যিনি তাঁহার অর্থ সম্বন্ধে বলিতেন, 'ভগবান ইহা আমাকে দান করিয়াছেন।' তিনি সুবিখ্যাত রকফেলার ফাউণ্ডেশান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যাহার ঔষধ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা পৃথিবীর সকল জায়গার লোকদের সাহায্য করিয়াছে। গুগেনহেইম পরিবারকে আমরা দেখিয়াছি, যাঁহাদের দাতব্য-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতি বৎসর একলক্ষ ডলারেরও বেশী বৃত্তি দেওয়া হয় শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিদ্বজ্জনদের, যাঁহারা অর্থাভাবে নিজেদের কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন না। মেলন এবং ক্রেস ইউরোপ হইতে যে-সব শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা এখন জনসাধারণের প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষিত আছে। যে-কোন মার্কিণ নাগরিক ইচ্ছা করিলেই সেইগুলি গিয়া দেখিতে পারে। জে, পি, মর্গ্যানের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত মর্গ্যান লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ এখন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ইহা বাস্তবিকই একটা বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ মার্কিণী চরিত্রবৈশিষ্ট্য।

অবশ্য মার্কিণ ইতিহাসের এই সময়কার স্বার্থান্ধ কোটিপতিদের পক্ষে ওকালতি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমাজে তাহারাও ছিল। জনসাধারণের জন্য তাহাদের কোন দরদ ছিল না। তাহারা ন্যায় ও অন্যায় যে কোন উপায়ে নিজেদের অর্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল : "জনসাধারণ জাহান্নমে যাউক"; আরেকজন ব্যক্তি, যাহার নাম এখন বিস্মৃত, ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বলিয়াছিল যে ভগবান তাহাদের হাতেই দেশের ভাগ্য নির্ধারণের ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাহারা ছিল স্বার্থপর, নির্দয় এবং অর্থলোভী ব্যক্তি। অল্প কয়েকজন অবশ্য দূরদর্শীও ছিল। তাহাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা চুরি করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না এবং উৎকৃষ্টেরা লক্ষ লক্ষ টাকা যেভাবে উপার্জন করিত সেই ভাবেই দান করিত। এই কোলাহল ও হট্টগোলের মধ্যেই আমেরিকার বিরাট শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠিল। ইহা স্থাপন করিতে প্রচুর অর্থ ও মানবজীবনের অপব্যয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহা স্থাপিত হইয়াছিল এবং অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতেই হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু অর্থ ও শক্তি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িল, কিন্তু সাধারণ মার্কিণ নাগরিকের জীবনযাত্রা এমন একটা উচ্চতর মানে গিয়া পৌঁছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে যাহা পূর্বে আর দেখা যায় নাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত মার্কিণ নাগরিক পৃথিবীর যে-কোন দেশের মানুষদের চেয়ে ভাল থাকা, ভাল খাওয়া এবং ভাল জিনিস এবং সুযোগলাভে বেশী স্বাধীনতা লাভ করিল।

এই প্রাসাদনির্মাণ ও অর্থার্জনের কোলাহলে কি মার্কিণ ভাবধারা ও তাহার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদর্শ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল? না, তাহা নয়। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেও হেনরী জর্জ, এড্‌ওয়ার্ড বেলামী এবং শ্রমিকদলের প্রথম মুখপাত্রেরা প্রতিবাদী কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন গণতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে। ১৮৮৮ সালে প্রেসিডেণ্ট ক্লিভল্যাণ্ড বলিলেন:

"যে পৌরসভাসমূহ আইনবলে প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের সেবক, সেই-গুলিই আজ দ্রুতগতিতে জনসাধারণের প্রভু হইয়া যাইতেছে।" ১৮৯৬ সালে উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ান একটা বক্তৃতা দিয়া ডেমোক্রেটিক দলের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মনোনয়ন লাভ করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন: "আজ আমি আপনাদের কাছে একটা পবিত্র আদর্শ রক্ষার আহ্বান জানাইতে আসিয়াছি। সেই আদর্শ স্বাধীনতার আদর্শের মতোই পবিত্র — ইহা মানবতার আদর্শ···যে-মানুষকে বেতনের বিনিময়ে কর্মে নিযুক্ত করা হয়, সে তাহার মালিকের মতোই ব্যবসায়ী······চৌরাস্তার মোড়ে যে-ব্যবসায়ীর দোকান রহিয়াছে, সে নিউইয়র্কের ব্যবসায়ীর চেয়ে কিছু কম নয়।···যে-কৃষক সকাল বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সারাদিন পরিশ্রম করে সে বাণিজ্য পরিষদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির মতোই ব্যবসায়ী ··· যে খনির মজদুর মাটির তলায় হাজার ফিট নীচে গিয়া কাজ করে সে জাঁদরেল পুঁজিবাদীদের মতোই ব্যবসায়ী ··· আমাদের পশ্চাতে এই জাতির ও সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদনকারী জনশক্তি রহিয়াছে···আমরা বলি······আপনারা এই শ্রমিকদের মস্তকে কণ্টক-মুকুট পরাইয়া দিবেন না, আপনারা মানবজাতিকে স্বর্ণনির্মিত ক্রুশে বিদ্ধ করিবেন না!"

ব্রায়ান আন্তরিক দেশসেবী। বাগ্মী যতটা ততটা চিন্তাশীল তিনি ছিলেন না। নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের সাধারণ ব্যক্তি ম্যাক্‌কিনলের কাছে তিনি পরাজিত হইলেন। তবুও, তিনি ব্যক্তিত্ব-শক্তি লইয়া বাস করিতেন, তাঁহার কথাগুলি দেশবাসীর মনে বাঁচিয়া রহিল। এমন সব মার্কিণী ছিল যাহারা যে-কোন উপায়ে অর্থার্জন উচিত বলিয়া মনে করিত; কিন্তু এমন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মার্কিণ নাগরিকও ছিল যাহারা নির্বিবাদে প্রতিবেশীরূপে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিত, যাহারা স্বাধীনতা ও অধিকারের ঐতিহ্য লইয়া গৌরব অনুভব করিত, যাহারা সৎ ও

সত্যবাদী নরনারীদের নিজেদের সঙ্গী করিয়া লইতে ইচ্ছুক ছিল এবং যাহারা পৃথিবীর যে-কোন দেশের নির্যাতিত ও অনশনক্লিষ্ট নরনারীর প্রতি মানবিকতার সম্পর্কে নিজেদের সাহায্যহস্ত প্রসারিত করিয়া দিত। ইউরোপীয় পর্যটকেরা আমেরিকার শিল্পকারখানার ঝন-ঝনাৎকার, তাহার স্থানীয় রাজনীতির দুর্নীতি এবং ডলার পূজার বহর দেখিয়া অনেক সময় বিরক্তি ও বিস্ময় বোধ করিত — কিন্তু তাহারা সাধারণ মার্কিণ নাগরিকের সহৃদয় বন্ধুত্বে মুগ্ধও হইত।

স্বাধীনতা কথাটাই তখনও সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিত — স্বাধীনতা বলিতে একটা কিছু বোঝায়, ইহাই সম্ভবতঃ সর্ববৃহৎ অলক্ষিত বাস্তব পদার্থ ছিল আমেরিকায়। ১৮৬০ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ৩ কোটি ২০ লক্ষ বিদেশী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া মার্কিণ সমাজ-ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে। হাঙ্গেরীয়, বোহেমিয়, ক্রোট্-বাসী, সার্ব, স্লোভাক্, পোলীশ, ইহুদী, ইতালীয়, রুমানিয়, রুশ, গ্রীক, অষ্ট্রীয় প্রভৃতি সর্বদেশীয় লোকের বন্যা এই দেশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তাহারা সকলেই সেই পুরাতন কারণেই আসিয়াছিল — স্বাধীনতা, জীবনের সুযোগ, উন্নতির আশা। কেহ কেহ প্রবঞ্চিত হইয়া গৃহস্থালীর কাজ করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল — কেহ বা স্টীলের কারখানায় মৃত্যু বরণ করিয়া অঙ্গারময় মাটির স্তূপের নীচে সমাধিস্থ হইয়াছিল। অনেকে আবার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভও করিয়াছিল। আমরা এই দাবী করি না যে, সকলেই এদেশে আসিয়া সমান সুযোগ ও শ্রেষ্ঠ সুবিধা পাইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়াছিল অল্প মাহিনার মজুররূপে, বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র দেখিয়া কিংবা দালালদের দ্বারা লক্ষপতি হইবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া। বহু লোক এখানে আসিয়া কল-কারখানায় ও খনিতে কষ্টকর জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহা দাবী করিতে পারি যে, প্রত্যেক নূতন আগন্তুকের দলই নিজের ইচ্ছামত

জীবিকানির্বাহের স্বাধীনতা লাভ করিত। কাহারও পক্ষে ইহা কঠিন ছিল, কাহারও পক্ষে ছিল সহজ। কিন্তু এডামিক, পুপিন, স্টেইনমেৎস, রিজ্, ল্যাজারাস্, লুডসেন, কারমেক ও সারোয়ান — অ্যাডামস্, ব্রাউন, স্মিথ ও ডগলাসের মতোই মার্কিণী নাম। তাহারা নিজেদের শক্তি, প্রতিভা ও গুণের দ্বারা নিজদিগকে মার্কিণ করিয়া লইয়াছিল। তাহারা তাহাদের নিজেদের কিংবা তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক বিদেশ হইতে আনীত উপহার দ্বারা আমেরিকাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। আজ তাহারা আমাদের রক্তমাংসের সহিত একাত্ম।

বিশ্বশক্তিরূপে উন্নীত

১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণতি লাভ করে। অর্থনৈতিক ও শিল্পনৈতিক দিক দিয়া বহুপূর্বেই এই দেশ বিশ্বশক্তির মর্যাদা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু স্প্যানীশ-মার্কিণ যুদ্ধের পর এই দেশ রাজনৈতিক দিক দিয়া পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ শক্তির সহিত সমান আসন গ্রহণ করে।

এই যুদ্ধের প্রধান কারণ স্প্যানীশ শাসন হইতে কিউবার মুক্তি। প্রকাশ্য কারণ, হাভানা বন্দরে মার্কিণ যুদ্ধ জাহাজ 'মেইন'-এ রহস্য-জনকভাবে বিস্ফোরণ যাহার ফলে ২৬০ জন মার্কিণ নাবিক ও অফিসার নিহত হয়। মার্কিণীরা পশ্চিম ভূখণ্ডের সকল জাতির প্রতিই ঐতিহ্যগত-ভাবে মৈত্রীভাব পোষণ করিত, বিশেষ করিয়া যে-জাতি নিজেদের পথে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিত তাহাদের প্রতি। 'মেইন' জাহাজের দুর্ঘটনায় মার্কিণীরা মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইল। যাহাই হউক, ইহা বলা প্রয়োজন যে, বহু বৎসর ধরিয়াই কিউবার যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য মার্কিণদেশবাসীদের মধ্যে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল। কিউবাতে

মার্কিণ পুঁজি ও বাণিজ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তবে মার্কিণদের পক্ষে আরও একটু ধৈর্য ও বিচক্ষণতা প্রদর্শিত হইলে স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই সমস্যা বিনা রক্তপাতেই সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু যাহা হইবার হইল, যুদ্ধ বাধিল।

ইহার প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে একজন মার্কিণ সাংবাদিক একটি প্রবন্ধে স্পেন ও আমেরিকার যুদ্ধের একটি নিরাশাজনক এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে মার্কিণ নৌবাহিনী ধ্বংস হইবে, নিউইয়র্কে কামান হইতে গোলা বর্ষিত হইবে এবং বেলুন হইতে ডিনামাইট বোমা আমেরিকার নগর সমূহে বর্ষণ করা হইবে। কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত।

কোন ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইবার মতো প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু ফলাফল দেখিয়া বোঝা গেল, স্পেনের যুদ্ধায়োজন ছিল নিকৃষ্টতর। মার্কিণ নৌবাহিনী যেখানে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ যোদ্ধৃদল লইয়া গঠিত, স্প্যানীশ নৌবাহিনী সেখানে ছিল উপযুক্ত অস্ত্রসজ্জাবিহীন ও অবহেলিত। ম্যানিলা ও সান্টিয়াগোতে স্প্যানীশ যুদ্ধজাহাজসমূহ তাহাদের পূর্বতন ঐতিহ্য অনুযায়ী অসমসাহসিকতায় যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র নির্ভীকতার দ্বারা উন্নততর অস্ত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। দুইটি স্প্যানীশ নৌবাহিনী ধ্বংস হইল, মার্কিণ পক্ষে মাত্র কুড়িজনেরও কম লোক নিহত হয়। লা গুয়াসিমাস্, এল ক্যানি এবং সান্ জুয়ানের যুদ্ধে স্প্যানীশ সৈন্যরা বীরত্ব ও রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু চারি মাসের মধ্যেই স্পেনের সামরিক ও নৌবল বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এই নূতন পৃথিবীতে সে তাহার শেষ ঘাঁটিটুকুও হারাইয়া ফেলিল।

অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতায় আমেরিকার এই নিশ্চিত জয়লাভ সমগ্র ইউরোপকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দেয়। সেই সময়ে একটা প্রচলিত

ধারণা ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি সমৃদ্ধিশালী উন্নত দেশ, সামরিক দিক দিয়া সে-দেশ শক্তিশালী নয়। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, কোন এক প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্বযুদ্ধে একজন অজ্ঞাতনামা প্রতিযোগী অপ্রত্যাশিতভাবে চ্যাম্পিয়নকে মুষ্টিযুদ্ধে পরাজিত করিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, এই যুদ্ধের ফলেও ইউরোপের মনের অবস্থা হইল তাহাই। পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নূতন ও অমিত শক্তির আবির্ভাব ঘটিল।

ইহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার নাগরিকদের উপর কী প্রভাব বিস্তার করিল? ব্যবহারিক ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল। পোর্টোরিকো যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া গেল। কিউবার উপরও যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষামূলক কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিবার সময়ে কংগ্রেস এই মর্মে এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল যে, "এতদ্বারা যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপের উপর কোনপ্রকার সার্বভৌম অধিকার, কর্তৃত্ব কিংবা শাসন স্থাপনের ইচ্ছা কিংবা অধিকার অস্বীকার করে, তবে যতদিন পর্যন্ত দ্বীপের অবস্থা শান্ত না হয় এবং দ্বীপের অধিবাসীরা নিজেদের শাসনব্যবস্থার ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করে ততদিন পর্যন্তই এই দ্বীপে মার্কিণ কর্তৃত্ব থাকিবে।" গুয়াম এই দেশের শাসনাধীনে আসিল। মাত্র দুই কোটি ডলারের বিনিময়ে স্পেনের নিকট হইতে ফিলিপাইন ক্রয় করিয়া সেখানকার দেশবাসীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্কিণী-শক্তি সেই দেশ অধিকার করিতে চলিল। এই সময়েই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিল।

যে-যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই নিঃসঙ্গ থাকিয়া নিজের দেশের ভাগ্য নিজের উপায়েই পরিচালিত করিতে চাহিত, সেই দেশই সহসা বহুদূর বিস্তৃত অধিকারভুক্ত দেশ ও অধীন জাতিসমূহের প্রভুত্ব লাভ করিল। মনে হইল, ইহা যেন এক মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সুরু। বহু প্রতিপত্তিশালী মার্কিণদেশবাসী ফিলিপাইন অধিকারকে মার্কিণ আদর্শের বিরোধী বলিয়া

প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কার্যকে 'মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ' বলিয়াই অভিহিত করিতেন। কিন্তু পুডিং-এর স্বাদ না খাইলে বোঝা যায় না। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদও বাস্তবে কী রূপ ধারণ করিল তাহা আমাদের দেখা প্রয়োজন।

কিউবাতে যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক গভর্ণর, জেনারেল উড্ কিউবাবাসীদের এক গণ-পরিষদ আহ্বান করিলেন কিউবার সংবিধান রচনার জন্য। সংবিধান গৃহীত হইল, কিউবাও তাহার নিজস্ব প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, সেনেট, প্রতিনিধি-পরিষদ প্রভৃতি লইয়া একটি সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইল। যাহাই হউক, সংবিধানে একটি সংশোধন—প্ল্যাট সংশোধনের বলে যুক্তরাষ্ট্র কিউবার স্বাধীনতা ও সত্ত্বা রক্ষা করিবার জন্য সেই দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করিল। পরবর্তী বিশ বৎসরের মধ্যেই আমেরিকা কয়েকবারই এইরূপ হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সালে এক নূতন চুক্তি দ্বারা প্ল্যাট সংশোধন প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। আজ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিউবার আভ্যন্তরীণ কার্যে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার আর নাই। অর্থনৈতিক দিক দিয়া এবং কিউবার প্রতিষ্ঠানসমূহে মার্কিণ পুঁজি নিয়োগের ফলে কিউবা এখনও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আবদ্ধ। ইহাতে কিউবাবাসীরা যে সব সময়ই সঠিক উপকৃত হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু দুইটি সাধারণতন্ত্রই উভয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মৈত্রীর সম্পর্কের জন্য আগ্রহশীল এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে কিউবার ক্ষমতাও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

পোর্টোরিকোর অধিবাসীরা মার্কিণ নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছে। তাহাদের শাসন পরিষদে জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পোর্টোরিকোর অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল। অভিভাবকরূপে যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যার সমাধান এখনো করিতে পারে নাই।

তবুও, দ্বীপবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে, রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হইয়াছে, বাণিজ্য ও ব্যাবসা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পোর্টোরিকোর নূতন অধিবাসীরা স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

১৯০০ সালের এক আইনে হাওয়াই রাজতন্ত্রাধীন প্রাক্তন সমস্ত নাগরিকদের মার্কিণ নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবেই শাসিত হইয়া থাকে এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে, এককালে ইহা যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্যে পরিণত হইবে। হাওয়াই দ্বীপের আইন-পরিষদ জনসাধারণের নির্বাচিত ভোটে গঠিত একটি পরিষদ ও সেনেট। গভর্ণর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এখান হইতে একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। অপূর্ব সুন্দর ও উর্বর এই দ্বীপপুঞ্জ উষ্ণমণ্ডলীয় বিবিধ উৎপাদনে সমৃদ্ধিশীল। বলা যাইতে পারে যে, মার্কিণ রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে হাওয়াই সন্তুষ্ট এবং ক্রমে রাজ্যের অধিকার লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

ফিলিপাইনের অবস্থা একটু অন্যরকম, কৌতূহল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই দেশকে বলপূর্বক অধিকার করা হইয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মার্কিণ শাসনের বিরুদ্ধে ফিলিপিনোদের বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ১৯০২ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ শাসনে ফিলিপাইনে স্কুল ও রাস্তাঘাট নির্মিত হইল, বসন্ত-কলেরা দূর করা হইল, স্কুলে শিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা ১৮৯৮ সালে ছিল পাঁচ হাজারেরও কম, তাহা বাড়িয়া ১৯২০ সালে প্রায় দশ লক্ষে পরিণত হইল। ম্যানিলাতে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ৮০% হইতে কমাইয়া ২০%এ আনা হয় এবং বড় বড় জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হয়। ফিলিপাইনের লোকসংখ্যা ১৯০০ সালে ছিল ৭০ লক্ষ, আজ তাহা

১ কোটি ৬০ লক্ষ। ১৯১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র 'যখনই একটি স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে' তখনই ফিলিপাইন হইতে চলিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৩৪ সালে টাইডিংস-ম্যাকৃডাফি আইনে বলা হইল যে দশ বৎসর একজন ফিলিপাইন প্রধান অধিকর্তার অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন কমনওয়েলথ সরকার কর্তৃক কার্যপরিচালনার পর ফিলিপাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। ১৯৩৫ সালে গৃহীত ফিলিপাইন-সংবিধানে জনসাধারণের ভোটে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা হয়। সংবিধানে ধর্ম, সংবাদপত্র এবং জনসভা সম্পর্কিত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। জাপানীদের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারাগুলি কার্যকরী ছিল। উৎসাহী, বুদ্ধিমান, কর্মনিপুণ ও স্বাধীনতাকামী একটি জাতি মার্কিণ শাসন ব্যবস্থায় কতকগুলি সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবী করিয়াছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র বিনা দ্বিধায় সেই অধিকার তাহাদের দিয়াছিল। জাপানীদের বিরুদ্ধে দ্বীপপুঞ্জকে রক্ষা করিবার কার্যে ফিলিপিনো এবং মার্কিণ সৈন্য পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছিল। এই প্রতিরোধ এত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল যে, জেনারেল ম্যাকআর্থার তাহার জন্য একটি শব্দচয়ন করিয়াছিলেন 'ফিলামেরিকান'। ফিলিপাইন বিনা দোষে যে-স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধারের জন্যও আমেরিকা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আবার যাহাতে কমনওয়েলথের পতাকা, স্বায়ত্তশাসনশীল স্বাধীন নরনারীর পতাকা সেই দ্বীপপুঞ্জে উড্ডীয়মান হয় আমেরিকা সেই কর্তব্য সম্পাদনে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

গুয়াম, মিডওয়ে এবং ওয়েক এই তিনটি প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার নৌঘাঁটি। যে-সমস্ত স্থান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে হারাইয়াছে, সেগুলি যুদ্ধেই পুনরুদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ডেনীশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা ডেনমার্কের নিকট হইতে ১৯১৭ সালে ২,৫০,০০,০০০ ডলারের

বিনিময়ে ক্রয় করে। সেইগুলিই এখন যুক্তরাষ্ট্রের কুমারী দ্বীপমালা বা "ভার্জিন আইল্যাণ্ড্স্"।

ইহাই মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ — যে সাম্রাজ্যবাদের ফলে কিউবা-সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফিলিপাইন-কমনওয়েলথ গড়িয়া উঠিয়াছে, পোর্টোরিকোর অধিবাসীরা পূর্ণ মার্কিণ নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছে এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেশের মর্যাদা ও দেশবাসীরা মার্কিণ নাগরিকরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সকল সময়েই যে এই নীতি বিচক্ষণতা ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে একথা বলা চলে না।

কিন্তু প্রত্যেকটি নবাধিকৃত অঞ্চলেই এই দেশ বিদ্যায়তন, আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি, স্বায়ত্তশাসনের প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে। এই দেশ কোন জাতিকে এই কথা বলে নাই: "তোমরা যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থাতেই তোমাদিগকে থাকিতে হইবে। তোমরা আমাদের দাস হইতে বাধ্য।" এই দেশ বলিয়াছে: "নিজেদের শিক্ষিত করিয়া তোল— স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা লাভ কর। আমরা তোমাদের হইয়া চিরকাল শাসনকার্য চালাইব না — ইচ্ছা করিলে আমরা তাহা পারি। কিন্তু তাহাতে আমাদের অস্বস্তি বোধ হয়। আমরা বিদ্যাশিক্ষা প্রবর্তনে বিশ্বাস করি, আমরা বিদ্যায়তন ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা তারকা ও বিচিত্রবর্ণ রেখালাঞ্ছিত পতাকার তলে কাহারও দাসত্বে বিশ্বাস করি না। আমরা আমাদের প্রথম যাত্রারম্ভের কথা মনে রাখিয়াছি, স্বাধীনতার দুর্গমপথে আমাদের সেই অভিযান আমরা বিস্মৃত হই নাই। আমরা তাঁবেদার রাষ্ট্র চাই না, বরং আমরা স্বাধীন ও সহযোগী প্রতিবেশী রাষ্ট্র চাই যাহারা এই পশ্চিম ভূমণ্ডলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে।"

ইহাই মার্কিণ নীতি: এই নীতিকেই কমবেশী মার্কিণীরা কার্যে পরিণত করিয়া আসিয়াছে। আমরা এই দাবী করি না এবং দাবী করিতেও পারি না যে, আমরা কোন ভুল করি নাই। কোন জাতিই কলঙ্কবিমুক্ত নয়; যুক্তরাষ্ট্রের গায়েও সেই দাগ রহিয়াছে। কিন্তু অন্য জাতিকে ধ্বংস ও অধীনতাবদ্ধ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী একটি পদক্ষেপ করিয়াই এই দেশ আর এক পদক্ষেপে পিছাইয়া আসিয়াছে। আমরা বহুবার হাইতি, নিকারাগুয়া ও ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্রে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু সেই সৈন্য আবার প্রত্যাহারও করিয়াছি। আমাদের প্রতিবেশী সাধারণতন্ত্র মেক্সিকোতে বিরাট বিপ্লবের সময়ে একবার মার্কিণ নৌবাহিনী ভ্যারাক্রুজে অবতরণ করিয়াছিল, অন্য এক সময় ভিলা যখন মার্কিণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অভিযান চালাইয়াছিল, তখন মেক্সিকোতে মার্কিণ অভিযাত্রীবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কী ঘটিল? নৌবাহিনী ও অভিযাত্রী বাহিনী উভয়েই স্বদেশে ফিরিয়া আসিল, কোন দেশ তাহারা অধিকার কিংবা জয় করিয়া আসে নাই। মেক্সিকোর সহিত আমাদের কোন যুদ্ধ হয় নাই। মার্কিণীরা এই বলিয়া চীৎকার করে নাই যে, মেক্সিকোতে আমাদের 'বাস করিবার মতো জায়গা' চাই, কিংবা মধ্য-আমেরিকাকেও যুক্তরাষ্ট্রের সমান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে পরিণত করিতে হইবে। ডলার কূটনীতি, উঁচু-দরের কূটনীতি সমস্তই লোপ পাইল। তাহার পরিবর্তে মিত্র প্রতি-বেশীর কূটনীতি স্থান লাভ করিল। এমন একজন প্রতিবেশী যে প্রতি-বেশীই থাকিতে চায়, প্রভু হইতে চায় না। আমরা এই নীতিই অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। বর্তমান যুদ্ধে মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার সাধারণ-তন্ত্রসমূহ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বৃহৎ এবং শক্তিশালী দুইটি সাধারণ-তন্ত্র ব্যতীত আর সকলেই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগ দিয়াছে এবং তাহাও স্বেচ্ছায়।

পানামা খাল অঞ্চলটি চল্লিশ মাইল দীর্ঘ এবং দশ মাইল প্রশস্ত একখণ্ড জমি। যুক্তরাষ্ট্র ১৯০৩ সালের ১৮ই নভেম্বর নবগঠিত পানামা সাধারণতন্ত্রের সহিত এক চুক্তি করিয়া ঐ অঞ্চলের 'ব্যবহার, অধিকার ও শাসন'এর কর্তৃত্ব লাভ করে। সেইজন্য প্রথমেই পানামা সরকারকে আমাদের দিতে হইয়াছিল ১,০০,০০,০০০ ডলার। তাহার নয় বৎসর পর হইতে প্রতি বৎসর একটা বাৎসরিক খাজনা দেওয়া সুরু হয়—তাহার পরিমাণ বর্তমানে ৪,৩০,০০০ ডলারে নির্ধারিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের গভর্ণর ওয়াশিংটনে সমর-সচিবের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং যুদ্ধের সময় প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক একজন সামরিক অফিসার সেখানে গভর্ণররূপে নিযুক্ত থাকেন।

খালটি যন্ত্রবিজ্ঞানের সাফল্যের চমৎকার নিদর্শনস্বরূপ। ইহা দুই মহাসমুদ্রের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগসূত্ররূপে কাজ করে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নৌরক্ষা-কার্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অবশ্য ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, এই স্থানটি অধিকার করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাহার দুর্বল প্রতিবেশী কলম্বিয়া সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবের উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাইয়াছিল, যদিও সেই বিপ্লব রক্তপাতহীনই ছিল। ইহাতে ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহে বিরাট সন্দেহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তখনও আমেরিকার আন্তরিক ইচ্ছা — প্রতিবেশীদের ভীতি উৎপাদন না করিয়া তাহাদের বন্ধুত্বলাভের প্রেরণা — এই গোলমাল মিটাইয়া ফেলে। ১৯২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র পানামায় বিপ্লব ঘটানোর এবং খাল-অঞ্চল অধিকারের ব্যাপারে সমস্ত ভুল বোঝার অবসান ঘটাইবার জন্য কলম্বিয়া সাধারণতন্ত্রকে ২,৫০,০০,০০০ ডলার দিয়া দেয়। এই অর্থদানের সময় হইতেই এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার সামরিক আধা-সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিবর্তিত হইয়া মিত্র-প্রতিবেশীর নীতির দিকে চালিত হয়। সেই নীতিই আমরা আজ অনুসরণ করিতেছি।

ইহাই আমেরিকার ইতিহাস-পঞ্জী। আমরা বলি না, এই ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধকালীন অক্ষশক্তিবর্গ তাহাদের প্রতিবেশীদের সহিত যে ব্যবহার করিত তাহার সহিত এই ইতিহাসকে তুলনা করিলেই সত্য উদ্ঘাটিত হইবে। আমাদের পর্যটকেরা রুমাল হাতে লইয়া দেশভ্রমণে যায়, অন্য জাতিকে বন্দী করিবার জন্য শিকল তাহাদের হাতে থাকে না। প্রভুর জাতি—প্রভুর রাষ্ট্র ইত্যাদি ভাবধারা আজ পর্যন্ত কোনদিন মার্কিণ জাতির কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কোন ব্যক্তি এই ভাবধারায় বিশ্বাসী হইয়া এই ব্যক্তিতান্ত্রিক জাতিকে পরিচালিত কিংবা তাহার নেতৃত্ব করিতে পারিবে না।

যে আমেরিকাকে আমরা জানি

১৯০০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত মার্কিণ জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সংগ্রামও চলিয়া আসিয়াছে। থিওডর রুজভেল্টের 'ন্যায্য ব্যবহার', উড্রো উইলসনের 'নূতন স্বাধীনতা', ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের 'নূতন বণ্টন' ('নিউ ডীল') প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই এই সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ করিয়াছে। এই সংগ্রাম সকল স্বাধীন জাতির মধ্যেই চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে—রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদের মধ্যে এই সংগ্রাম। একদল মনে করেন, যে প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে সেই রকমই থাক। অন্যদল পরিবর্তন ও সংস্কার চাহেন। একদল মনে করেন জনসাধারণকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, অন্যদল মনে করেন তাহাদিগকে আরও ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই জাতির সংগ্রাম আজও চলিয়াছে, আজও তাহাদের প্রচেষ্টার বিরাম নাই, আজও তাহারা সন্ধান করিয়া চলিয়াছে এমন কোন ব্যবস্থার যাহা শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর জন্য নহে, সমস্ত জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জিনিস এই যে, ইহা শুধু একটি আইনের পরিবর্তে অন্য আইন প্রবর্তন কিংবা একজন প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে অন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নহে। এই সংগ্রামটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিণীরা আর যাহাই হউক তাহারা নিস্তেজ জাতি নহে।

গত শতাব্দীর নবম দশকে ধনতন্ত্রের লৌহযুগের সেই বিরাট সম্প্রসারণের যুগে অনেকের কাছে মনে হইত যে, এই বন্যা অব্যাহত গতিতেই চলিবে যতদিন পর্যন্ত না বিভিন্ন ট্রাস্ট ও যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিত হইয়া একটি সুপার-ট্রাস্ট গঠন করিবে এবং ক্রোড়পতিদের হাতেই দেশের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। যখন কোটিপতি এবং বিরাট যৌথপ্রতিষ্ঠান সমূহের মালিকেরা বেশ দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা লাভ করিয়া বসিল, সেই সময় জনসাধারণ প্রশ্ন করিতে লাগিল, "কেন? কেন শিশুরা কারখানায় কাজ করিবে? যদি মালিকেরা একজোট হইতে পারে তাহা হইলে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবে না কেন? ধনপতি হওয়া কি পুণ্যকর্ম, একসময়ে আমরা যাহা ভাবিতাম, না শুধু অর্থের জন্যই এই অর্থার্জন? কেন আমাদের পৌরসভা এবং রাজ্য-সরকার আরো ভালোভাবে পরিচালিত হয় না? আমাদের প্রাচীন মার্কিণ ভাবধারার কী হইল — অল্প ধন ও স্বল্প দারিদ্র্যের ভাবধারার? যে বিরাট শিল্পোৎ-পাদনের যন্ত্র আমরা প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছি তাহাতে কী হইবে — কে ইহার পরিচালক? কে ইহার লভ্যাংশ ভোগ করে? এই বণ্টন কি ন্যায্য?"

যাহারা এই ধরণের প্রশ্ন করিত তাহাদিগকে সংস্কারবাদী, পাগলাটে, অত্যুৎসাহী এবং লম্বা-চুল ভাববাদী বলিয়া অভিহিত করা হইত — কিন্তু তাহাদের জিজ্ঞাসা সমানভাবেই চলিল। তাহাদের এই জিজ্ঞাসার ফলেই বহু পরিবর্তন, বহু পরীক্ষা, বহু সংস্কার সাধিত হইল।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি স্মরণীয়।

এই দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ধনবান কয়েকজনের জন্য বহুমূল্য কয়েকটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য গড়িয়া তোলা হয় নাই। এইগুলি গড়িয়া তোলা হইয়াছে বহু লোকের জন্য অল্পমূল্যে বহু জিনিস তৈরী করিবার জন্য। মার্কিণ শিল্পের প্রকৃত দৃষ্টান্ত হইতেছে ফোর্ড গাড়ী, একডলার দামের ঘড়ি, দশসেণ্ট পাত্রের স্থপ, সস্তা সংবাদপত্র, নিঃশুল্ক রেডিও, তৈরী পোষাক, লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করিয়া মাত্র চুয়াল্লিশ সেণ্ট খরচায় তাহা দেখিবার সুযোগ ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিস এবং অনুরূপ আরও হাজার হাজার জিনিস প্রস্তুত করিতে বিশেষ নিপুণতা ও দক্ষতার প্রয়োজন। জিনিস ভাল না হইলে মার্কিণীরা তাহা প্রত্যাখ্যান করে। তাহারা এমন গাড়ী পছন্দ করে না যা খুব দৌড়াইতে পারে না, যে ঘড়ি টিক্ টিক্ আওয়াজ করে না কিংবা যে টেলিফোন বা চুঙ্গি তাড়াতাড়ি বিকল হয় সেগুলি তাহারা পছন্দ করে না। তাহারা আরামদায়ক, নিপুণভাবে তৈরী সাধারণ জিনিসের অল্পদাম আশা করিতে অভ্যস্ত। সব সময়ে তাহারা শ্রেষ্ঠ জিনিস লাভ করে না— অনেক ইউরোপীয় জিনিস মার্কিণ জিনিসের চেয়ে মজবুত, সুন্দর ও টেঁকসই। কিন্তু ঢালাও উৎপাদন এবং ঢালাও ক্রয়ের ফলে আমেরিকার প্রত্যেকটি সাধারণ পরিবারই প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করিতে পারে, যাহা পরিবারের জীবন-যাত্রাকে সহজতর, সুন্দরতর ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে। বহু লোকের সঙ্গেই মার্কিণ ব্যবসায়ীদের কারবার, তাই বহু লোকের কাছে বিক্রয় করিয়াই তাহারা লাভবান হয়। অবশ্য অর্থার্জনের জন্যই তাহারা ইহা করে। কিন্তু ইহা করিবার ফলেই সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়া চলিয়াছে। মার্কিণীরা আরও উন্নততর ভবিষ্যতের আশা রাখে।

মার্কিণ সমাজ রাজনীতি ও ব্যাবসা উভয় ক্ষেত্রেই এখনও পরিবর্তমান, স্থিত নহে। প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্ক্লিন ডি, রুজভেল্ট একটি প্রাচীন মার্কিণ

পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পরিবার জাতির সেবার জন্য প্রসিদ্ধ এবং বংশগতভাবে ইঁহারা বেশ স্বচ্ছল। তাঁহার স্বরাষ্ট্রসচিব কর্ডেল হাল, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন — রেলপথ হইতে দশ মাইল দূরে কোনও গ্রামে। পূর্ববর্তী বাণিজ্যসচিব ও লেণ্ড-লীজ পরিকল্পনার অধিকর্তা হ্যারী হপকিন্সের পিতা আইওয়াতে ঘোড়ার খুর তৈরী করিতেন। ম্যাসাচুসেট্সের গভর্ণর লিভারেট সল্টনস্টল, বৃটিশ নাইট স্যার রিচার্ড সল্টনস্টলের বংশধর। রিচার্ড সল্টনস্টল ১৬৩০ সালে ম্যাসাচুসেট্সের বে উপনিবেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। নিউইয়র্কের মেয়র ফিওরেলো এইচ্, লা গার্ডিয়া একজন ইতালীয় ব্যাণ্ডমাস্টারের পুত্র। বিখ্যাত শিল্পপতি লেফ্টেনাণ্ট-জেনারেল উইলিয়াম ক্নুডসেন জন্মিয়াছিলেন ডেনমার্কে। সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য বিচারপতি ফেলিক্স ফ্র্যাঙ্কফার্টারের জন্ম অস্ট্রিয়ার ইহুদী পিতামাতার ঘরে। আমরা ইহা পছন্দ করি এবং এই জন্য আমরা গৌরবান্বিত। যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা এমন একটি দেশ দেখিতে চাই যেদেশে মানুষ তাহার নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে — তাহার পিতার জুতার উপর নহে এবং যেখানে মানুষ তাহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করে। এই দেশ সকল সময়েই এই আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

আমেরিকা বিদ্যাশিক্ষায় বিশ্বাসী। তাহারা সর্বসাধারণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং কোন একটা বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষায় বিশ্বাসী। স্কুলগৃহই আমেরিকার সত্যিকারের পরিচয়-প্রতীক — তাহার যুদ্ধজাহাজ কিংবা ট্যাঙ্ক নহে। যুক্তরাষ্ট্রে ১,৬০০-র অধিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ আছে; ১৯৩৮ সালে এই বিদ্যায়তনসমূহে ১৩,৫১,৯০৫জন ছাত্রছাত্রী ছিল। ১৯৪০ সালে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩,০০০ এবং ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫,০০০ ছাত্র ছিল। অবশ্য এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপদ্ধতিই ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের

প্রাচীন ঐতিহ্যের মতো নহে। নাৎসী-পূর্বযুগের জার্মাণ ব্যায়ামশিক্ষাগার, ফরাসীদেশ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহের বিদ্যায়তনে শিক্ষাদান পদ্ধতি যেরূপ পূর্ণাঙ্গ, আমেরিকার বহু বিদ্যালয় তাহা ভাবিতেও পারে না। কিন্তু এই আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মধ্য হইতেই ১৯৩০ সালের পর তিনজন নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন পদার্থবিদ্যায়, দুইজন রসায়নবিদ্যায়, দুইজন চিকিৎসা ও শরীরতত্ত্বে এবং তিনজন সাহিত্যে। আপনি মার্কিণ শিক্ষার্থীদের দেখিবেন ক্যালিফোর্ণিয়ায় হোমার পড়িতেছেন, কান্‌সাসে পাঠ করিতেছেন রেসাইন এবং পেনসিল-ভ্যানিয়াতে পড়িতেছেন গ্যেটে। আমেরিকার আদর্শই হইল সমস্ত জাতিকেই শিক্ষিত করিয়া তোলা, যাহারা উচ্চশিক্ষাভিলাষী তাহাদের জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করা। আজ পর্যন্ত সেই আদর্শে তাহারা পৌঁছাইতে পারে নাই। কিন্তু সাফল্যের দিকেই এই দেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কোন সামরিক শ্রেণীর ব্যক্তিরা জাতীয় ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে না। এই দেশের সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর অফিসারেরা রাজনীতি হইতে দূরে থাকেন এবং প্রথম হইতেই তাঁহারা দূরে রহিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোন মার্কিণ জেনারেল অথবা এডমিরাল সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। ওয়েস্ট-পয়েণ্ট ও আনাপলিসে সামরিক ও নৌ-বিদ্যা শিক্ষায়তন কেন্দ্রে যোগদানেচ্ছু প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক রাজ্য হইতে এবং তাহাদিগকে প্রবেশের পূর্বে কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ হইতে হয়। সম্ভ্রান্ত বংশ কিংবা অর্থবল কোনটার দ্বারাই কেহ উক্ত বিদ্যায়তনে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না কিংবা কেহ ঐখানে পড়াশোনায় সুবিধা করিতে না পারিলে কোন রাজনৈতিক প্রভাবই তাহাকে সেখানে রাখিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সমস্ত জাতির

সম্পত্তি এবং সমগ্র জাতিরই উহা প্রতিনিধিত্ব করে। এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতিও একজন অসামরিক নাগরিক—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

বর্তমানকালের যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে এই কথাগুলি জানা দরকার। আমরা আমাদের সম্মুখীন প্রত্যেক সমস্যা সমাধান করিয়াছি বলিয়া দাবী করি না। বস্তুতঃ, আমরা জানি তাহা আমরা পারি নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ, শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক আইন, শিল্প সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ, শিল্পোৎপাদন রক্ষার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে আমরা গ্রেট বৃটেন ও বহু ইউরোপীয় দেশের পিছনে পড়িয়াছিলাম। বিগত ত্রিশ বৎসর আমরা এই ব্যবধান পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, ক্রমশঃ আমরা তাহা পূর্ণও করিতেছি। আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা আইন সম্পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু ইহা কার্যকরী। গত দশ বৎসরে আমাদের যে শ্রমিক সংগঠন সাধিত হইয়াছে তাহাও পরীক্ষার পর্যায়েই রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাই বড় কথা। আমাদের দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। প্রত্যেক মার্কিণীই ভাল বেতন, ভাল বাড়ী ও ভাল আহার্য পায় না। কিন্তু আমরা আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, আমাদের অতীতের চেয়ে মহত্তর ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, যে ভবিষ্যৎ সাধারণ মানুষের, যাহারা আমাদের মেরুদণ্ড, আমাদের শক্তি এবং যাহাদের সহযোগিতার উপর আমাদের সমগ্র স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির উন্নয়ন নির্ভর করে। আমরা মানুষ হিসাবে আমাদের অধিকার রক্ষা করিয়া চলি।

অনেকে যেমন আশংকা করিয়াছিলেন যে, আমরা ধনতান্ত্রিক ও মুনাফাখোর জাতিতে পরিণত হইব—সেইরূপ আমরা হই নাই। অনেকের আশংকানুযায়ী আমরা উচ্ছৃঙ্খল জনতাতেও পরিণতি লাভ করি নাই। ভবিষ্যতেও হইব না। কারণ, আমরা শান্তভাবে বসিয়া থাকিয়া অন্যায় অবিচার সহ্য করি না। আমেরিকাতে এমন কোন অন্যায় সংঘটিত হয় নাই, যাহাকে স্পষ্টভাবী মার্কিণীরা লোকের সামনে

তুলিয়া ধরিয়া আক্রমণ ও নিন্দা করেন নাই। এই শতাব্দীর প্রথম দিন হইতেই নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া আমাদের অগ্রগতি হইয়াছে, একটানা উত্থানের দিকেই নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা অগ্রসরণই। যখনই বিপুল অর্থ এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হইয়া জনসাধারণের স্বাধীনতাকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিবে মনে হইয়াছে, তখনই থিওডর রুজভেল্ট সেই বিপুল অর্থের অনিষ্টকারিতাকে নিন্দা করিয়া জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন শিল্পোৎপাদন সম্পর্কে সরকারী বিধিনিষেধ প্রণয়ন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উড্রো উইলসন তাঁহার প্রথম উদ্বোধনী বক্তৃতায় গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেন: "আমরা আমাদের শিল্পোন্নতির জন্য গৌরবান্বিত, কিন্তু ইহাতে মানুষকে কতখানি মূল্য দিতে হয় সেই সম্পর্কে চিন্তা করিবার অবসর আমরা পাই নাই।··· যে মহৎ সরকারকে আমরা ভালবাসি, সেই সরকারকে অনেক ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছে, তাহারা জনসাধারণকে ভুলিয়া গিয়াছিল···সমান অধিকার ও সুযোগ কখনই প্রবর্তন করা যাইবে না ···যদি নরনারী ও শিশুরা এই বিরাট শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার হাত হইতে নিজেদের জীবন ও প্রাণশক্তিকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারে, কারণ শ্রমশিল্প যে সামাজিক প্রথার প্রবর্তন করে তাহাকে পরিবর্তন, তাহার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন কিংবা এককভাবে তাহার সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই···আমি সমস্ত সৎ মানুষকে আহ্বান করিতেছি···আমাকে সমর্থন করিবার জন্য।" ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট তাঁহার প্রথমবারের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবার সময়ে নির্বাচনী বক্তৃতায় 'এই বিস্মৃত মানুষ যাহারা অর্থনৈতিক পিরামিডের খিলান তৈয়ারী করিয়াছে' সোজাসুজি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাদের সাহায্যের জন্য অবশ্যই কিছু করা কর্তব্য।

ইহা শুধু বক্তৃতাই নয়। কথাকে কাজে পরিণত করিয়া মার্কিণ

নাগরিকদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়, সেই জন্য আইনও প্রণীত হয়। এই আদর্শবাদের প্রেরণা—উপযুক্ত ও সমান জীবনযাত্রার অনুসন্ধান—আমেরিকায় নূতন নহে, ক্ষণস্থায়ীও নহে। এই সম্পর্কে ভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। এই প্রেরণার উৎস আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহ্য ও গভীরতম বিশ্বাস। ইহা আমাদের হৃদয় ও মনেরই একটি অংশবিশেষ। এই অনুসন্ধানের পথে আমরা অনেক হাস্যকর ভুল করিব—মদ্যপান নিবারণ তাহাদের অন্যতম। কিন্তু ভুল ধরিতে পারিলেই আমরা তাহা সংশোধন করিয়া লই। কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতা, স্বাধীন বক্তৃতা দানের স্বভাব এবং স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার লাভের ফলে আত্ম-সংশোধনের একটা ক্ষমতা আমাদের হইয়াছে। আগে অথবা পরে কোন না কোন সময়ে এই ক্ষমতা অবশ্যই ব্যবহৃত হয় এবং জনসাধারণের ইচ্ছাই সর্বদা কার্যকরী হইয়া থাকে।

আমেরিকা ও পৃথিবী

ইতিপূর্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমেরিকা সর্বপ্রথম একটা বিশ্বশক্তির মর্যাদা লাভ করিয়া সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদের রোমাঞ্চকর অভিযানের পথে পা দিয়াছিল। আমরা দেখাইয়াছি ঐ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কী ছিল এবং কী ভাবে তাহা কাজ করিত। সেই প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, উহা পরদেশ অধিকার ও পর জাতিকে অধীন করিবার ইচ্ছা লইয়া মার্কিণ ডিক্টেটরী সাম্রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠে নাই। উহা ছিল এমন কতকগুলি অধীন দেশের সমষ্টি যাহাদের মধ্যে কয়েকটি স্বায়ত্ত-শাসনশীল ছিল, কোনটি ছিল স্বায়ত্তশাসন লাভের পথে অথবা যুক্ত-রাষ্ট্রের রাজ্য-পদ-মর্যাদা লাভের পথে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আমেরিকা মহাদেশে ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা

ক্রয় করিবার পর আর কোন দেশ অধিকার করে নাই। এই আলাস্কাও পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রেরই অন্যতম রাজ্যে পরিণত হইবে। যাহাই হউক, পৃথিবীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কী হইল এবং কি করিয়া অবস্থা পরিবর্তিত হইল তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন।

১৯০০ সাল হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে আমেরিকাবাসীরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না যে, ইউরোপের যুদ্ধে তাহারা জড়াইয়া পড়িবে। 'ইউরোপীয় কলহ হইতে দূরে থাক' — এই প্রাচীন উপদেশ ও প্রচীন মতবাদ আমেরিকাবাসীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র যে ইউরোপ ও এশিয়ার কোন শক্তির সহিত কলহ চাহিত না তাহাই শুধু নহে, এই কলহের চিন্তাটাও উদ্ভট বলিয়া মনে করিত।

তবে আমেরিকাবাসীরা জানিত যে, পৃথিবীর পরিধি সংকুচিত হইয়া গিয়াছে — যে সমুদ্র অতিক্রম করিতে পূর্বে ছয় সপ্তাহ হইতে তিনমাস পর্যন্ত সময় লাগিত এখন সেই সমুদ্র দ্রুতগামী জাহাজে অতিক্রম করিতে লাগে মাত্র একসপ্তাহ। তাহা ছাড়া টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি পৃথিবীর দূরতম প্রান্তকেও দ্রুত সংযুক্ত করিয়া দিতেছে। তাহারা জানিত, এশিয়ায় কোন মহামারী লাগিলে সেই ব্যাধি আমেরিকার তীরে পৌঁছিয়া আমেরিকাবাসীর প্রাণহানি ঘটাইতে পারে। তাহারা জানিত, তাহাদের নিজেদের ব্যাবসা সাতসমুদ্র অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। তাহারা জানিত, এশিয়ায় দুর্ভিক্ষ কিংবা ইউরোপে আতঙ্ক দেখা দিলে আমেরিকাতেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। তাহারা জানিত যে তাহাদের পূর্বপুরুষদের স্বপ্নের অতীত পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের সহিত তাহাদের দৈনন্দিন সংযোগ সাধিত হয়। তবুও তাহারা সমুদ্রের অপর পারের দিকে না তাকাইয়া নিজেদের দেশের দিকেই বেশী দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়াছে। তাহারা দর্শকের কৌতূহল নিয়া ইউরোপ ও এশিয়ার ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ করিত, কিন্তু এইগুলি তাহাদিগকে

স্পর্শ করিত না। কান্সাসের কৃষক কিংবা নিউইয়র্কের কেরানী হয়তো সমুদ্রপারের রাজ্যাভিষেক, ভূমিকম্প, বিদ্রোহ, কিংবা আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিত — কিন্তু সেগুলি ছিল তাহার জীবন পরিধির বাইরে। সন্থ-আগত বহিরাগতরা হয়তো তাহাদের পূর্বতন জন্মভূমির রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহারা একটি নূতন জীবন ও নূতন পদ্ধতির শিক্ষা লাভ করিতেছিল এবং এইগুলি তাহার কাছেও ছিল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস। আমেরিকাবাসী ইহাও জানিত যে পৃথিবীতে অন্যান্য দেশে তাহাদের শাসনপদ্ধতি ছাড়াও অন্য সরকারী প্রথা রহিয়াছে — রাজতন্ত্র, সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি। সে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকে ইহা জানিয়াছে, কিংবা অন্য কোন আমেরিকাবাসীর নিকট হইতে অথবা দেশভ্রমণ করিয়া সে এই বিষয়ে নিজেই শিক্ষালাভ করিত। আসল কথা এই যে, এই ধরণের শাসনপ্রথা অন্য দেশে রহিয়াছে বলিয়া সে চিন্তান্বিত হইত না। হয়তো কোন অত্যাচারী শাসনপ্রথার দেশ হইতে নির্বাসিত ব্যক্তিদের সে নিজের দেশে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইত। সে হয়তো রাশিয়ার জারতন্ত্রকে নিন্দা করিত এবং তাহার নির্যাতনপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করিত। কোন বৃহৎ রাষ্ট্র কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে উৎপীড়ন করিলে সে অত্যাচারিতের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিত। কখনও বা ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের পক্ষ হইয়া স্বেচ্ছাসেবক রূপে সে যুদ্ধও করিয়াছে। তিনসহস্র মাইল দূরেও গৃহহীন ও ক্ষুধার্তদের জন্য সে অর্থ, খাদ্য, ঔষধপত্র এবং যাবতীয় সাহায্য প্রেরণ করিয়াছে এবং করিবে। কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়া সে অন্যান্য জাতিকে নিজের পথে যাইতে দিয়া আসিয়াছে, যতদিন তাহার নিজের পথে কেহ হস্তক্ষেপ না করিয়াছে। সে আশা করিত যে, কোন এক সময়ে, অন্যান্য জাতিও তাহার দেশের মতোই গণতান্ত্রিক প্রথা অবলম্বন করিবে এবং তাহার মতে, এই পথেই উদারনৈতিক উন্নততর

পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে। কিন্তু সে তাহার গণতান্ত্রিক মতবাদ অন্যান্য জাতির ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাহে নাই।

ইহাই ১৯১৪ সালের সাধারণ মার্কিণ নাগরিকের একটি ন্যায্য বিশ্লেষণ। হয়তো ইহাকে অনেকেই নেতিবাচক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বলিবেন, কিন্তু ইহাই ছিল আন্তরিক। তাহার পর হইতেই অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ, বহু আমেরিকাবাসীর কাছেই, যদিও সকলের কাছে নয়, প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধটা ছিল সংবাদপত্রের কাহিনীর মতোই। তাহারা চিন্তা করে নাই যে ইহা তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। বিদেশী শক্তিগুলির মধ্যে এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাহারা একটা না একটা পক্ষ বাছিয়া লইয়াছিল যেমন লোকে খেলার মাঠে দুইদলের একদল বাছিয়া নেয়। বৃটেনের সহিত আমেরিকার যে প্রবল যোগসূত্র কথাবার্তা, সংস্কৃতি, পুঁথি-পুস্তক ও সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে বহু আমেরিকাবাসী মিত্রশক্তির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত আমেরিকার ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধাও কার্যকরী হইল। কিন্তু আরও লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসীও ছিল যাহাদের পূর্বপুরুষেরা আসিয়াছিল জার্মানী হইতে — অপূর্ব সঙ্গীত আর মহৎ বিজ্ঞানের দেশ জার্মাণী। তাহারা হয়তো কাইজার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তা করিত না, তাহাদের পিতৃ-পিতামহ হয়তো জার্মাণীতে স্বাধীনভাবে বাস করিতে না পারিয়াই আমেরিকায় চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন বন্ধন ছিল সুদৃঢ়।

ক্রমশঃ অবস্থা গুরুতর হইতে লাগিল। জার্মাণ সাবমেরিণের আঘাতে মার্কিণ জাহাজডুবি হইল, মার্কিণ নাগরিক নিহত ও জলমগ্ন হইল। যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে জার্মাণী ও গ্রেট বৃটেনের কাছে তীব্র প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইলেন — তাহাদের যুদ্ধের ফলে মার্কিণ অধিকার

কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কিন্তু একটা কঠিন বাস্তব সত্য রহিয়া গেল। গ্রেট বৃটেনের আক্রমণে কোন মার্কিণ জীবন নষ্ট হয় নাই। জার্মাণদের আক্রমণেই গভীর সমুদ্রে দুইশত নয়জন মার্কিণীর জীবনহানি হয়।

তবুও আমেরিকা যুদ্ধ হইতে দূরেই থাকিতে চাহিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োগ করিলেন। তিনি যুধ্যমান জাতিসমূহের নিকট শান্তির আবেদন জানাইলেন—তিনি নিজে সকল সম্ভাব্য উপায়ে মধ্যস্থ হইতে রাজী হইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। জার্মাণ সম্রাটের সরকার অবাধ সাবমেরিণ যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করিলেন। পরে প্রকাশিত পুস্তকাদি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ইহা জার্মাণ সরকার ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছিলেন। তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল এই আশায় যে শত্রুপক্ষ সমুদ্রের এই তীরে তাহার সৈন্যবল আনিবার পূর্বেই তাহাকে ধ্বংস করা যাইবে।

এই চ্যালেঞ্জ সোজাসুজিই আসিয়া পড়িল এবং বিপদও আসন্ন হইয়া উঠিল। ইহা সত্য এবং সকল সময়ের জন্যই সত্য যে যুক্তরাষ্ট্র তাহার জাতীয় নিরাপত্তার জন্যই অতলান্তিক মহাসাগরের উপর কোন শত্রু কিংবা আক্রমণাত্মক শক্তিকে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে দিতে পারে না। কিন্তু ১৯১৭ সালে শুধু এই কারণেই আমেরিকাবাসীর হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে নাই। তাহারা দেখিতে পাইল, তাহাদের স্বদেশের সম্মান বিপন্ন, তাহাদের পতাকা বিনাকারণে আক্রান্ত, তাহাদের স্বাধীনতা সংকটের সম্মুখীন।

১৯১৭ সালের ২রা এপ্রিল প্রেসিডেণ্ট উইলসন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ঘোষণা করিলেন: "আমার শাসনতান্ত্রিক কর্তব্যের প্রতি দ্বিধাহীনচিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যে এবং এই কার্যের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়াই আমি কংগ্রেসকে এই উপদেশ দিতেছি তাহারা যেন জার্মাণ সম্রাটের সরকারের পক্ষ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার

ও জাতির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কার্যাবলীকে যুদ্ধের সামিল বলিয়া ঘোষণা করেন···শান্তির চেয়েও অধিকার বেশী মূল্যবান, যে অধিকারকে আমরা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি সেই গণতন্ত্রের জন্য আমরা যুদ্ধ করিব; আমরা যুদ্ধ করিব দেশের সরকারে দেশবাসীর অধিকারের জন্য; আমরা যুদ্ধ করিব ক্ষুদ্রজাতিসমূহের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য; আমরা যুদ্ধ করিব সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের ঐক্যের জন্য যাহাতে সমস্ত দেশে সমস্ত জাতির মানুষদের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করিয়া পরিণামে সমস্ত পৃথিবীকেই আমরা মুক্ত করিতে পারি।”

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণ—এই জন্যই তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল।

তাহার পর কী ঘটিয়াছিল আপনারা জানেন। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই আমরা ২০,০০,০০০ এরও বেশী মার্কিণ সৈন্য ফ্রান্সে প্রেরণ করিলাম। আমেরিকার শিল্প ও জনশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হইল। জার্মাণ জেনারেল লুডেনডরফ্ বলিয়াছিলেন, “আমেরিকাই যুদ্ধের প্রধান নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইল।” ফলে জার্মাণী ও তাহার মিত্রশক্তির সম্পূর্ণ পরাজয়ের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

আমাদেরও ক্ষতি হইয়াছিল—নিহত ও আহতের সংখ্যায় প্রভূত সে ক্ষতি। রক্ত ও ধন উভয়ই আমরা ব্যয় করিয়াছিলাম। কোন রাজ্য আমরা লাভ করি নাই। ইউরোপে যেটুকু জমি আমরা পাইয়াছিলাম তাহার পরিমাণ জনপ্রতি ছয় ফুট মাত্র, যেখানে আমাদের মৃত সৈনিকদের শেষ শয্যা রচিত হইয়াছিল—এবং সে-জমিটুকুও আমাদের নিজস্ব নয়। যে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল তাহা চিরকালের জন্য, সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইবার কোন আশা ছিল না। কিন্তু যে আদর্শের সত্যতায় আমরা বিশ্বাসী ছিলাম তাহার জন্যই আমরা যুদ্ধ করিয়াছিলাম—সেই জন্য অর্থব্যয় কিংবা সংগ্রামী প্রচেষ্টা কোনটাই মার্কিণ জাতি ক্ষতি বলিয়া স্বীকার করে নাই।

আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেন একটি জাতিসংঘের, একটি বিশ্ববিচারালয়ের এবং এমন একটি বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার পদ্ধতির যাহা, তিনি যুদ্ধ ঘোষণার সময় বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করিবে এবং সমস্ত পৃথিবীকেই পরিণামে মুক্ত করিবে।' বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার জন্য তিনি নিম্নোদ্ধৃত চৌদ্দ দফা কর্মসূচীর নির্দেশ দিয়াছিলেন:

১. প্রকাশ্যভাবে গৃহীত প্রকাশ্য শান্তিচুক্তি, যাহার পর রাষ্ট্রগত-ভাবে আর কোন আন্তর্জাতিক বুঝাপড়া করা চলিবে না কিন্তু কূটনীতি সর্বদাই সরলভাবে এবং জনসাধারণকে জানাইয়া চালাইতে হইবে।

২. আন্তর্জাতিক কার্যক্রম কিংবা আন্তর্জাতিক চুক্তির বলে কোন সমুদ্রে জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করা না হইলে কোন দেশের নিজস্ব সমুদ্রসীমা ব্যতীতও সর্বত্র সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে।

৩. শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ও শান্তিরক্ষায় আগ্রহশীল সমস্ত জাতিসমূহের মধ্যে যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধক দূর করিতে হইবে এবং সমভাবে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের অধিকার দিতে হইবে।

৪. এমন আশ্বাস দিতে হইবে এবং গ্রহণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক জাতি ঘরোয়া নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যতখানি প্রয়োজন ততখানি পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জা কমাইয়া আনিবে।

৫. ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের সার্বভৌম অধিকার সম্পর্কিত স্বার্থ এবং ঔপনিবেশিক শাসক সরকারসমূহের স্বার্থ সমভাবে ও নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া এই ঔপনিবেশিক দাবীসমূহের নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৬. রাশিয়ার সমস্ত অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া নিতে হইবে এবং রাশিয়ার স্বার্থসম্বলিত সমস্ত বিষয়ের এমন একটি সমাধান করিতে হইবে যাহাতে সে অব্যাহতভাবে তাহার নিজস্ব স্বাধীন রাজনৈতিক মতবাদ এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের সর্বপ্রকার সহযোগিতা সম্পর্কে আশ্বাস লাভ করিতে পারে। এই সঙ্গে তাহাকে নিজের ইচ্ছামত যে কোন প্রথায় সমাজ পরিচালনা করিতে দিয়া স্বাধীন জাতিসমূহের সমাজে যোগদানের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণের আশ্বাস দিতে হইবে। শুধুমাত্র আমন্ত্রণ নহে, তাহার প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সহযোগিতা সে চাহিলেই পাইবে এইরূপ আশ্বাসও দিতে হইবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়ার প্রতি অন্যান্য জাতি যে ব্যবহার করিবে তাহাতেই তাহাদের শুভেচ্ছার অগ্নিপরীক্ষা হইবে। তাহাতেই বোঝা যাইবে বিচক্ষণতা ও নিঃস্বার্থ সহানুভূতি লইয়া তাহারা রাশিয়ার প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে কিনা।

৭. সমস্ত পৃথিবীই স্বীকার করিবে বেলজিয়াম হইতে অবিলম্বে সৈন্য অপসারণ করিয়া তাহার সার্বভৌমত্ব, যাহা সে অন্যান্য স্বাধীন জাতির ন্যায় ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতিসমূহ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া নিজেরা যে আইন প্রণয়ন করিয়াছে, এই কার্যদ্বারা তাহার প্রতি যেরূপ আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, অন্য কোন কার্যদ্বারাই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সান্ত্বনাকারী পন্থা অবলম্বিত না হইলে আন্তর্জাতিক আইনের বৈধতা ও ভিত্তি চিরকালের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৮. ফরাসীদের সমস্ত রাজ্য মুক্ত করিতে হইবে এবং যে অঞ্চল অধিকৃত করা হইয়াছে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। প্রুশিয়া

১৮৭১ সালে আলসাস্‌-লোরেন অঞ্চল সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল, যাহার ফলে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হইতেছে, তাহার সুবিচার করিতে হইবে যাহাতে সকলের জন্য শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

৯. সুস্পষ্ট জাতিগত ভিত্তিতে ইতালীর সীমান্তরেখা পুনর্নির্ধারিত করিতে হইবে।

১০. অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর জনসাধারণের আসন আমরা সমস্ত জাতি-সমষ্টির মধ্যে সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই; তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের উন্নতি বিধানের জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হইবে।

১১. রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে; অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিতে হইবে; সার্বিয়াকে সমুদ্রে প্রবেশ করিবার অবাধ ও সুরক্ষিত সুযোগ দিতে হইবে। বিভিন্ন বল্‌কান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঐতিহাসিক-ভাবে নির্ধারিত জাতি ও আনুগত্যের সীমারেখার ভিত্তিতে স্থির করিতে হইবে। বিভিন্ন বল্‌কান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রিক সংহতির জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

১২. বর্তমান অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তুর্কী অঞ্চলসমূহে স্থায়ী সার্বভৌমত্বের আশ্বাস দিতে হইবে, কিন্তু অন্যান্য যে সমস্ত জাতি বর্তমানে তুর্কীদের অধীনে রহিয়াছে তাহাদিগকে জীবন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নিরাপত্তা এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণ নির্বিবাদ সুযোগ দিতে হইবে। দার্দানেলস্‌ প্রণালী আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী সমস্ত জাতির বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলের জন্য চির-স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

১৩. যে-সমস্ত অঞ্চলে নিঃসন্দেহে পোলিশদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে

তাহাদিগকে লইয়া একটি স্বাধীন পোলিশ রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে এবং এই রাষ্ট্রকে সমুদ্রে গমনের অবাধ ও নির্ভয় সুযোগ দিতে হইবে। এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রিক সংহতি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে সংরক্ষিত করিতে হইবে।

১৪. বিভিন্ন বৃহৎ রাষ্ট্র ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রিক সংহতি সমভাবে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি সুস্পষ্ট চুক্তিদ্বারা সমস্ত জাতির একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে।

এই সমস্ত অন্যায় দূরীকরণে এবং ন্যায়াধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যে আমরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যবদ্ধ সমস্ত সরকার ও জাতিসমূহের সঙ্গে আন্তরিক অংশীদাররূপেই নিজেদের মনে করি। এই স্বার্থ ও এই উদ্দেশ্যসাধনে আমরা বিচ্ছিন্ন কিংবা বিভক্ত হইতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইব।

এই সমস্ত চুক্তি ও ব্যবস্থার জন্য আমরা যুদ্ধ করিতে রাজী আছি এবং এই আদর্শ লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাইব। এই কার্যক্রম আমরা অনুসরণ করি এই কারণে যে, আমরা অন্যায় দূর করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিতে চাই এবং যুদ্ধের প্রধান উস্কানি দূর করিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা আগ্রহশীল। জার্মাণদের মহত্ত্বের জন্য আমরা ঈর্ষ্যান্বিত নহি, আমাদের কর্মসূচীতে সেইরূপ কোন ইঙ্গিতও নাই। জ্ঞানের দিক দিয়া বা শান্তিমূলক কোন প্রচেষ্টায় তাহাদের কৃতিত্বে আমরা বিবাদী নহি, সেই দিক দিয়া তাহারা খুব উজ্জ্বল ও ঈর্ষ্যার যোগ্য কৃতিত্ব অর্জনও করিয়াছে। আমরা তাহাদের ন্যায্য কোনপ্রকার প্রভাব কিংবা শক্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চাই না। যদি তাহারা আমাদের সহিত এবং অন্যান্য শান্তিপ্রিয় জাতিসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার, আইন ও সুব্যবহার সম্পর্কিত চুক্তি স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত

অস্ত্র দ্বারা কিংবা প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যবস্থা দ্বারা যুদ্ধ করিতে চাই না। আমরা চাই, সেই জাতি আমাদের বাসস্থান এই নূতন পৃথিবীর জাতি-সমূহের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সমান অধিকার লাভ করুক, কিন্তু প্রভুরূপে নয়।

আমরা তাহার কোন সামাজিক কিংবা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন কিংবা সংশোধন চাই না। কিন্তু তাহার সহিত কোন আলাপ আলোচনা চালাইতে হইলে ইহা অত্যাবশ্যকভাবেই আমাদের জানা প্রয়োজন যে, তাহার মুখপাত্ররা যখন আমাদের সহিত কথা বলেন তখন কাহাদের পক্ষ হইয়া তাহারা কথা বলেন, রাইখ্স্ট্যাগের সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে, কিংবা সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব স্থাপনে বিশ্বাসী জঙ্গীবাদীদলের পক্ষে।

যেভাবে আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহের নিশ্চয়ই কোন অবকাশ আর থাকিতে পারে না। আমি যে কর্মসূচীর বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহার একটা মূলগত নীতি রহিয়াছে। এই নীতি সমস্ত জাতি ও সমস্ত দেশের প্রতি ন্যায়বিচারের নীতি, যে-নীতির বলে দুর্বল ও সবল সমস্ত দেশই সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করিয়া বাঁচিবার অধিকারী। যদি এই নীতির ভিত্তি সুদৃঢ় না হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের কোন অংশই টিকিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ অন্য কোন নীতির দ্বারাই কাজ করিতে পারে না। এই নীতি জয়যুক্ত করিবার জন্য তাহারা নিজেদের জীবন, সম্মান এবং সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। এই নীতির অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ মানুষের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ আজ সমুপস্থিত। এই পরীক্ষাকার্যে তাহারা নিজেদের সর্বশক্তি, মহত্তম উদ্দেশ্য এবং নিজেদের সংহতি পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। উইলসন একাই এইরূপ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন নাই। তাঁহার পূর্বে ও তাঁহার সময়েই অন্যান্য ব্যক্তিরা এই স্বপ্ন দেখিতেন। বহু জাতির সাধারণ মানুষ এই স্বপ্ন দেখিত এবং

তাহার বাস্তব রূপায়ণ আকাঙ্ক্ষা করিত। তাহা কার্যে পরিণত করাও অসম্ভব ছিল না।

কেন তাহা সম্ভব হয় নাই তাহার কারণ বলিতে গেলে প্রসঙ্গ দীর্ঘ হইয়া যাইবে। আমরা ভার্সাই সম্মেলনের বিবাদ-বিসংবাদ এবং দর-কষাকষির বর্ণনা এখানে করিতে পারিব না — ইহার ব্যর্থতার সকল কারণও বর্ণনা করিতে পারিব না। যদি আপনি বলিতে চান যে, যুক্তরাষ্ট্রই এই ব্যর্থতার জন্য অংশতঃ কিংবা মুখ্যতঃ দায়ী, আমরা তাহা লইয়া তর্ক করিব না। আদর্শবাদী ও মহৎ-চেতা উড্রো উইলসন তাঁহার স্বপ্ন সার্থক করিবার অনুকূল কতকগুলি বাস্তব দিক উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহার বিরোধীদলকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা চাহেন নাই। তিনি এই ধরণের বিশ্বসংঘে মার্কিণীদের সত্যিকারের স্বার্থ কী সেই সম্পর্কে আমেরিকার জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট বিশ্লেষণ করেন নাই। ক্ষুদ্রমনা ও স্বার্থপর মানুষেরা আমেরিকার এই বিশ্বসংঘে যোগদান ব্যর্থ করিয়া দিল — উড্রো উইল-সনের হৃদয় ভাঙিয়া গেল। তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করিলেন — শুধুমাত্র নিজের মতবাদের জন্যই নহে, সমস্ত দেশের মানুষ যাহারা শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা চায় তাহাদের জন্যও বটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজের ব্যর্থতা ও পরাজয় সম্পর্কে একটি কথা বলিয়াছিলেন: "আমার আদর্শ যে পরিণামে জয়ী হইবে সেই সম্পর্কে আমি স্থিরনিশ্চিত, যেমন নিশ্চিত যে ভগবান আছেন।"

উইলসনের ক্ষমতাচ্যুতির পর, মার্কিণ 'স্বাতন্ত্র্য' নীতি আবার কিছু-কালের জন্য মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু এরোপ্লেন তৈয়ার হইতে লাগিল এবং উড়িতে লাগিল — পৃথিবীর দূরত্বের ব্যবধান গ্রীষ্মের জলবিন্দুর মতো শুকাইয়া গেল। তখনও যুক্তরাষ্ট্র শান্তিস্থাপনের জন্য আগ্রহশীল। ১৯২১ সালে তাহার উদ্যোগে একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন

আহূত হয়। ১৯২৮ সালে এই দেশই কেলগ্ চুক্তি প্রণয়ন করিয়া জাতিসমূহের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু এরোপ্লেন তৈয়ার হইতে লাগিল এবং উড়িতে লাগিল — যে সমস্ত দেশ মানুষের স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারিত না তাহারা মানুষের অধিকারকে পদদলিত করিতে লাগিল এবং নিজেরা অক্ষশক্তির দেশে ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল।

জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুদয় এবং জাপানে নির্মম আক্রমণবাদী জঙ্গীবাদী দলের আবির্ভাবে ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালের পর বৃহত্তম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। অক্ষশক্তিবর্গের ডিক্টেটরী আক্রমণ সমস্ত দেশের সমস্ত জাতিকেই আঘাত করিল। তাহারা ঘোষণা করিল যে, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুত্ব করিতে তাহারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাহারা ঘোষণা করিল যে, প্রভুর জাতি ও দাসের জাতি স্থাপনে তাহারা মনস্থ করিয়াছে।

তাহা ছাড়া এই শৃঙ্খলিত এবং অন্ধকার পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি স্বাধীনতার দ্বীপকে তাহারা টিকিয়া থাকিতে দিতে পারে না। আমেরিকাবাসীদের অন্য যে-দোষই থাকুক না কেন, তাহাদের কিছুটা সাধারণ বিচারবুদ্ধি আছে। দাসত্ব তাহারা দেখিলেই বুঝিতে পারে; ডিক্টেটরী ব্যবস্থাকে তাহারা ঘৃণা করে; ভীতিপ্রদর্শন কাহাকে বলে তাহারা জানে এবং তাহা সহ্য করে না। তাহারা সংগ্রামী জাতি।

তাই আমরা, যুক্তরাষ্ট্র আবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। জাপানীদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার সহিত পার্লহারবারে আক্রান্ত হইয়া, জার্মানী, ইতালী ও তাহাদের মিত্রশক্তিদের কাছে হুমকি খাইয়া ও আক্রান্ত হইয়া, আমরা আবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। কেহ যেন আমাদিগকে ভুল না বোঝেন। এই যুদ্ধকে আমরা শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যাইব। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিল্পোৎপাদন শক্তিসম্ভার এবং সমস্ত যোদ্ধৃশক্তি ও জনবলকে আমরা

কর্মে নিযুক্ত করিয়াছি। যদি বহু বৎসর ধরিয়া এই সংগ্রাম করিতে হয়—যদি ইহার জন্য আমেরিকাবাসীদের এমন আত্মত্যাগ করিতে হয় যাহা ইতিহাসে আর পাওয়া যায় নাই—তবুও আমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাইব যতদিন পর্যন্ত অক্ষশক্তিগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া না যায়, তাহাদের ডিক্টেটরীবৃত্তি মানুষের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত না হয় এবং তাহাদের সামরিক ও নৌশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া না যায়। অর্ধেক স্বাধীন ও অর্ধেক অধীন দেশে যেমন আমরা বাস করিতে পারি নাই, তেমনি অর্ধেক স্বাধীন ও অর্ধেক দাস পৃথিবীতেও আমরা বাস করিতে পারিব না।

আজ যেসব মানুষ তাহাদের জাতভাইদের নির্যাতন করিতেছে, চিরকালের জন্য তাহারা ইহা করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যেই তাহারা গভীর খাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সেনাবাহিনী ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই চোরাবালিতে তাহাদের পা ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাদের গলার জন্য ফাঁসীর দড়ি বোনা হইতেছে। তাহারা নিজেদিগকে অজেয় ও সর্বজয়ী বলিয়া গর্ব করিয়াছে—ইতিমধ্যেই তাহাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে, অত্যাচার ও গর্ব করিবার মতো সময়ও আর তাহাদের নাই। স্বাধীন মানুষের দল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—রাষ্ট্রসঙ্ঘ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—স্বাধীনতার শুকতারা আকাশে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। যাহারা অত্যাচারীর সহিত সন্ধি করিতে চায় এবং ধূর্তের মতো তাহার কোলে আত্মগোপনের আশ্রয় লাভ করিতে চায়, তাহারা তাই করুক। নিজেদের বিপদের ঝুঁকি লইয়া তাহারা তাহা করিবে, কারণ এই জন্য অতি শীঘ্রই তাহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা স্বাধীনতা ও শান্তিকামী এবং ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী, তাহারা আমাদের সহিত হাত মেলান, তাঁহারা সহোদর ভাইয়ের মতোই আমাদের কাছে অভ্যর্থনা লাভ করিবেন।

যুদ্ধের পরে

এই ছোট বইটিতে দেখাইতে চাহিয়াছি, কী ধরণের লোক আমরা—যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু পরিচয়, কী আদর্শে ইহা বিশ্বাসী, কেমন করিয়া ইহা গড়িয়া উঠিল এবং কী ধরণের জীবনযাত্রা এই দেশ অনুসরণ করে। আমাদের সম্পূর্ণ ইতিহাস এখানে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আমরা সত্যের উপর রঙ্‌ চড়াই নাই। দোষ ও গুণ উভয়েরই আমরা বর্ণনা করিয়াছি। যে আদর্শে আমরা বিশ্বাসী সেই সম্পর্কে যথাযথ সত্যের অনুসরণ করিতেই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু একটা প্রশ্ন রহিয়াছে—একটা বড় প্রশ্ন—যাহা আমাদের মনে, বিশেষ করিয়া বিদেশের জাতিসমূহের মনে নাড়া দিয়াছে। অক্ষশক্তির উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য কী? ভবিষ্যতের পৃথিবী সম্পর্কে ইহার কী আশা, কী উদ্দেশ্য, কী-ই বা লক্ষ্য রহিয়াছে?

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের অভিলাষী নয়। অধীন জাতি ইহা চাহে না। প্রভুর জাতি হইতে ইহা চায় না। এই সমস্ত মতবাদই মার্কিণ জীবনযাত্রা, মার্কিণ ইতিহাস এবং মার্কিণ জনসাধারণের উন্নয়নের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ইউরোপীয় মহাদেশে ইহা এক ইঞ্চি জমিও চাহে না। পশ্চিম ভূমণ্ডলের কোথায়ও এই দেশ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের শাসনাধিকার বিস্তার করিতে চায় না। কোন দেশে, কোন জাতির উপরই এই দেশ নিজের অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করিতে চায় না। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই দেশ এমন কতকগুলি বিমানঘাঁটি প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করিবে যাহা তাহার জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শান্তিই এই দেশের কাম্য থাকিবে, যুদ্ধ

নহে। যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চায়—মৃতের শান্তি নহে, জীবিতের শান্তি—কারাগারের শান্তি নহে, পৃথিবীর স্বাধীন মানুষের শান্তি। মানুষের সম্মান ও প্রতিভায় সে বিশ্বাসী, এই দেশ মানবজাতির জন্য বিরাট সৌধনির্মাণে বিশ্বাসী।

যুদ্ধের শেষে এই দেশের মৌলিক নীতি ঘোষিত হইয়াছে চারটি স্বাধীনতার মধ্যে—বাক্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, দারিদ্র্য হইতে স্বাধীনতা, ভয় হইতে স্বাধীনতা। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্যই নহে, সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের জন্য এই চতুর্বিধ স্বাধীনতা তাহার কাম্য।

গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এই দেশ অতলান্তিক সনদ নামক চুক্তিতে কতকগুলি নীতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। সনদটি নিম্নলিখিত রূপ :

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি এবং গ্রেট বৃটেনের মহামান্য নৃপতির সরকারের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের পক্ষ হইতে কতকগুলি সাধারণ নীতি ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতের উন্নততর পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে বলিয়া তাঁহারা আশা রাখেন।

প্রথম, তাঁহাদের দেশ রাষ্ট্রিক বা অন্য কোন প্রকারে নিজেদের সম্প্রসারণ চাহে না;

দ্বিতীয়, কোন দেশের জনসাধারণের স্বাধীন মতবাদের বিরুদ্ধে কোন দেশের রাষ্ট্রিক পরিবর্তন তাঁহারা ইচ্ছা করেন না।

তৃতীয়, তাঁহারা প্রত্যেক জাতির নিজেদের সরকার গঠনের অধিকার স্বীকার করেন; যে সমস্ত জাতিকে বলপূর্বক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাদের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার তাঁহারা দেখিতে চান।

চতুর্থ, বর্তমানে যে সব চুক্তি আছে তাহা পালন করিয়াও তাঁহারা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, বিজয়ী বা বিজিত, সমস্ত জাতিকেই সমানভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর কাঁচামাল সংগ্রহ ও বাণিজ্য করিবার সুযোগ দিতে চেষ্টা করিবেন।

পঞ্চম, উন্নততর শ্রমিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে তাঁহারা অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত জাতির মধ্যে পূর্ণতম সহযোগিতা আনয়ন করিতে ইচ্ছুক।

ষষ্ঠ, নাৎসী বর্বরতার চরম বিনাশের পর তাঁহারা এমন শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা করেন যেখানে সমস্ত জাতি নিজেদের সীমানার মধ্যে নির্বিঘ্নে বসবাস করিতে পারিবে এবং যে অবস্থায় সমস্ত দেশের সমস্ত নরনারী দারিদ্র্য ও ভয় হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিতে পারে।

সপ্তম, এই শান্তিপ্রতিষ্ঠা সমস্ত মানুষকে বিনা বাধায় সমুদ্রে ও মহাসমুদ্রে ভ্রমণ করিবার সুযোগ দান করিবে।

অষ্টম, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সকল জাতিই, বাস্তবতা ও ধর্মনীতির কারণে, হিংসার পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। যেহেতু, স্থল, জল এবং বিমানবাহিনীর শক্তি যতদিন এই সমস্ত জাতি নিজের সীমানার বাহিরে অন্য জাতিকে ভয় দেখাইবার জন্য কিংবা আক্রমণ করিবার জন্য প্রয়োগ করিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সেইজন্য, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ব্যাপক ভিত্তিতে সকল দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত দেশকে নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য করা অপরিহার্য। শান্তি-কামী জনগণের ঘাড় হইতে এই অস্ত্রসজ্জা দূর করিবার জন্য তাঁহারা অন্যান্য সর্বপ্রকার সম্ভাব্য পন্থাই অবলম্বন করিবেন এবং উৎসাহ প্রদান করিবেন।”

অতলান্তিক সনদ বাইবেলের ‘দশটি নির্দেশ’ নহে, কিংবা ইহাই

সর্বশেষ ঘোষণা নয়। কিন্তু ইহার দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয় যে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সকল জাতির সহিত সহযোগিতা, অন্য জাতিকে জয় করা নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহ-সভাপতি হেনরী এ, ওয়ালেস্‌ ভবিষ্যৎ শান্তি সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন: "এই শান্তি সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নততর করিয়া দিবে, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডেই নহে, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, চীন ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহে — শুধুমাত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের দেশসমূহেই নহে, জার্মানী, ইতালী এবং জাপানেও।

"কেহ কেহ 'মার্কিণ শতাব্দী'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বলি, যে-শতাব্দীতে আমরা প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এই যুদ্ধের গর্ভ হইতে যে-শতাব্দীর জন্ম হইবে, তাহা সাধারণ মানুষেরই শতাব্দী হইতে পারে এবং অবশ্যই হইবে। হয়তো এই সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রায় স্বাধীনতা ও কর্তব্য সম্পাদনের পরামর্শ দানের সুযোগ আমেরিকার থাকিবে। প্রত্যেক দেশেই সাধারণ মানুষকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় নিজেদের হাতেই নিজেদের শিল্পকারখানা গড়িয়া তুলিতে শিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই সাধারণ মানুষকে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে শিখিতে হইবে, যাহাতে সে এবং তাহার সন্তানেরা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের ঋণ শোধ করিয়া দিতে পারে। কোন জাতিরই অন্য জাতিকে শোষণ করিবার ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার থাকিবে না।

নূতন দেশসমূহের শিল্পকরণের ব্যাপারে প্রাচীনতর দেশসমূহের সাহায্য করিবার সুযোগ থাকিবে, কিন্তু তাহা কোনক্রমেই সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীর মতবাদ এই জনগণের শতাব্দীতে কার্যকরী হইবে না। এই জনগণের শতাব্দীতে ভারতবর্ষ, চীন এবং লাতিন আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশের জনসাধারণ যখন শিক্ষিত হইবে এবং

উৎপাদনকারী শিল্পীতে রূপান্তরিত হইবে, তখন তাহাদের জীবনযাত্রার মান দ্বিগুণ এবং তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। আধুনিক বিজ্ঞানকে আন্তরিক-ভাবে জনগণের কল্যাণের কাজে লাগাইলে তাহার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা আমরা এখন পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না।"

এই নূতন পৃথিবী গড়িয়া তোলা যায়। অক্ষশক্তিবর্গের দ্বারা ইহা গড়া যায় না — তাহারা এইরূপ পৃথিবী চাহে না। তাহারা কোনদিনই ইহা গড়িয়া তুলিতে পারিবে না — তাহারা যুদ্ধ ও ভীতি প্রদর্শনের উপরেই বাঁচিয়া আছে। অক্ষশক্তিবর্গ ইহা পারিবে না, কারণ বিজ্ঞানকে তাহারা যুদ্ধের ভীতিপ্রদ অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করিয়াছে, শান্তির সেবক-রূপে নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আমরা সর্বদা বিজ্ঞানকে শান্তির সেবক এবং শক্তিশালী দক্ষিণ হস্তরূপেই বিবেচনা করি। এই যুদ্ধের সময়েও আমাদের বিজ্ঞানীরা এমন সব অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিতেছেন যাহার দ্বারা মানবতার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহাদের পক্ষে ইহা করা সম্ভব হইয়াছে, কারণ তাঁহারা স্বাধীন মানুষ, স্বাধীনভাবে তাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন, কাজ করিতে পারেন।

আমরা এই পৃথিবী গড়িয়া তুলিবার কার্যে সমস্ত স্বাধীন দেশের নরনারীকে আমাদের পাশে আহ্বান জানাই। যাহারা নির্যাতিত ও দুঃখক্লিষ্ট তাহাদিগকে আমরা আহ্বান জানাই। যাহারা বর্বরতাকে ঘৃণা করে এবং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহাদিগকেও আমরা আহ্বান জানাই। আমরা আহ্বান জানাই তাহাদের যাহারা নিজেদের সন্তানদের স্বাধীন দেখিতে চাহে।

শত্রুরা বলিয়াছে যে, এই যুদ্ধ আগামী সহস্র বৎসরের জন্য মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত করিবে। আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে তিনশত বৎসরের ইতিহাস — মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারে বিশ্বাসী জনসাধারণের তিনশত বৎসরের ইতিহাস। এই

বিশ্বাস অলস-কল্পনা নহে—এই বিশ্বাসই আমাদিগকে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মহৎ করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি, ইহার দ্বারা উন্নতি করি, ইহার নামেই জীবন ও মৃত্যুকে বরণ করি। আমরা শেষ পর্যন্ত ইহার জন্য যুদ্ধ করিব।

এই যুদ্ধ কি করিয়া চালাইতে হয় তাহাও আমরা জানি। আমাদের অস্ত্র আছে, আমাদের জনবলও আছে; আমাদের বুদ্ধি আছে, নৈপুণ্য আছে, শক্তিও আছে। আমাদের খাদ্যসম্ভার প্রচুর, ইস্পাত, তৈল কিংবা ধাতবদ্রব্য কোনটাই আমাদের কম নাই। যদি যুদ্ধজয়ের জন্য প্রতিবৎসর আমাদিগকে একলক্ষ বিমান তৈয়ার করিতে হয়, আমরা তাহাও করিব। যদি প্রত্যেক নাগরিককে সশস্ত্র শক্তি বৃদ্ধির জন্য অস্ত্রচালনায় এবং অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণ ও আনুষঙ্গিক বাণিজ্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিতে হয়, আমরা তাহাও করিব। যদি তাহার জন্য আমাদিগকে চরম ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করিতে হয়, পৃথিবী কখনও যাহা দেখে নাই, আমরা তাহাও করিব। কারণ ইহা চরম যুদ্ধ এবং আমরা ইহা শেষ করিতে চাই এমন ভাবে যাহাতে আমাদের সন্তানেরা এবং ভবিষ্যতের সমস্ত সন্তানেরাই নূতন বিশ্বযুদ্ধ ও অত্যাচারের আতঙ্কাকুল ছায়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

ইহাই আমাদের লক্ষ্য, ইহাই আমাদের পতাকার অর্থ। স্বাধীনতা ও আশাই ইহার অর্থ। ইহার অর্থ সাধু প্রতিবেশী, প্রভু নহে। এই আদর্শ মানুষকে নিজের ভাগ্য নির্ধারণের এবং নিজেদের শাসন পরিচালনার অধিকার দেয়। এই আদর্শ শান্তিকামী মানুষদের ভগবৎ-প্রদত্ত দুর্জয় শক্তি দেয় যাহাতে নিজেদের দেশ আক্রান্ত হইলে তাহারা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে। এই আদর্শের অর্থ এমন একটা দেশ ও জাতি যে-দেশ মানুষের উপর এবং মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী; এই আদর্শ মানুষের প্রতিষ্ঠার আয়ত্তাধীন একটা স্বাধীন পৃথিবীতে বিশ্বাস করে।

আমেরিকা

আমেরিকার অতীত ও বর্তমানে তাহার স্বপ্নকে রূপায়িত করিবার যে-সমস্ত বাণী ঘোষিত হইয়াছে তাহা আর একবার শ্রবণ করুন :

"আমাদের পিতৃ-পিতামহ ছিলেন ইংরেজ ; তাঁহারা এই বিরাট সমুদ্র অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং এই নির্জন অরণ্যে মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা শুনিলেন, তাঁহাদের বিপদে তিনি সাহায্য করিলেন। তাঁহারা ভগবানের জয়ধ্বনি করুন...যাঁহারা ভগবানের আশীর্বাদে অত্যাচারীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই আজ সেই মুক্তির উপায় বর্ণনা করুন...আজ মানুষের সন্তানদের সম্মুখে তাঁহারা ভগবানের স্নেহশীল করুণা এবং অত্যাশ্চর্য কাহিনীর কথা স্বীকার করুন।"

উইলিয়ম ব্র্যাডফোর্ড, ১৬৪৭

"ভগবানের নামে শান্তি হউক। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা...এতদ্দ্বারা... এই চুক্তি দ্বারা নিজেদের একটি নাগরিক শাসন প্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত করিলাম।"

মেফ্লাওয়ার চুক্তি, ১৬২০

"...আমাদের অন্যান্য ডোমিনিয়নের মতোই আমাদের দেশবাসীও ইংলণ্ডের নাগরিকরূপে সকল প্রকার স্বাধীনতা, ভোটাধিকার ও আইন-নির্দেশিত সুযোগ সুবিধা লাভ করিবে।..."

ভার্জিনিয়া সনন্দ, ১৬০৭

"নাগরিক শাসনের সমস্ত সার্বভৌম, মৌলিক ভিত্তি জনগণের উপর ন্যস্ত — জনগণ নিজেদের ইচ্ছামত যে-কোন রকম শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, যাহা তাহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে।..."

রোজার উইলিয়মস্, ১৬৪৪

"বিবেকের তাড়নায় অপরের উপর অত্যাচার শান্তির অগ্রদূত যীশু খ্রীষ্টের মৌলিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী।"

রোজার উইলিয়ম্স্, ১৬৪৪

আমেরিকা

"জনসাধারণকে অবশ্যই সেবা করিতে হইবে।"

উইলিয়ম পেন, ১৬৯৩

"জীবন কি এতই প্রিয়, শান্তি কি এতই মধুর যে দাসত্বের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিতে হইবে? ভগবান, রক্ষা করুন! অন্যেরা কোন্ পথ বাছিয়া লইবে জানি না; আমি এইটুকুই বলিতে পারি, হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু!"

প্যাট্রিক হেনরী, ১৭৭৫

"আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে জানি যে, সকল মানুষ সমান রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে; প্রত্যেক মানুষকেই স্রষ্টা কতকগুলি মৌলিক অধিকার দিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও সুখ-লাভের প্রচেষ্টা অন্যতম। এই অধিকার রক্ষার জন্যই মানুষের মধ্যে শাসিতের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকার গঠিত হয়..."

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

টমাস্ জেফারসন্, ১৭৭৬

"সকল জাতির প্রতি বিশ্বাস ও ন্যায়বিচার কর। সকলের সহিত শান্তি ও মৈত্রীর ভাব অর্জন কর..."

বিদায়কালীন বক্তৃতা

জর্জ ওয়াশিংটন, ১৭৯৬

সকল দেশের, সকল ধর্মের, সকল রাজনৈতিক মতবাদের লোকদের প্রতি সমান ও ন্যায্য বিচার; সকল জাতির সহিত শান্তিস্থাপন, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও সৎ বন্ধুত্ব স্থাপন...ধর্মের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, হেবিয়াস কর্পাসের বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত জুরীদের দ্বারা বিচার...এই নীতিই আমাদের উজ্জ্বল লক্ষ্য, ইহা অতীতেও আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছে...

প্রথম উদ্বোধনী বক্তৃতা

টমাস্ জেফারসন, ১৮০১

"সকল মানুষের প্রতি দয়া, কোন মানুষের প্রতি কোন ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ নয়, এমন কি যাহারা নিজেদের কার্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া মানুষকে দাস করিয়া রাখে তাহাদিগের জন্য করুণা প্রদর্শন করিয়া…"

জন, কুইন্সি অ্যাডাম্‌স্‌, ১৮৩৮

"একদা এখানে এই পুলের পাশে দাঁড়াইয়া এপ্রিল মাসের মৃদু হাওয়ায় নিজেদের পতাকা উড়াইয়া সেদিনের যুধ্যমান কৃষকেরা যে বন্দুকের গুলি ছুঁড়িয়াছিল তাহার শব্দ জগতের বিভিন্ন দিক হইতে শোনা গিয়াছিল।…"

র‍্যালফ্‌ ওয়ালডো এমার্সন, ১৮৩৬

"যাহারা নিপীড়িত এবং দুর্বলের পক্ষাবলম্বন করিয়া কথা বলিতে ভয় পায় তাহারা ক্রীতদাসের সামিল; ক্রীতদাস তাহারা যাহারা ঘৃণা, বিদ্রূপ এবং ভর্ৎসনার ভয়ে সংচিন্তা হইতে বিরত হয়।

সংপথে থাকিয়া মাত্র মুষ্টিমেয়ের সঙ্গী হইতে ভয় পায় যাহারা তাহারাও ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নহে।"

জেমস রাসেল লোয়েল, ১৮৪৩

"যাহারা স্বাধীনতাকে ভালবাসে এবং তাহা রক্ষা করিতে সর্বদা প্রস্তুত, কেবল তাহাদিগকেই ভগবান স্বাধীনতা দেন।"

ড্যানিয়েল ওয়েব্‌স্টার, ১৮৩৪

"ন্যায়বিচারই পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ…"

ড্যানিয়েল ওয়েব্‌স্টার, ১৮৪৫

"মৃত্যুর সময়ে এই নির্দেশই আমি দিয়া যাইব, তুমি যে ন্যায়ের পথে সেই সম্পর্কে সর্বদা নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রসর হও।"…

ডেভিড্‌ ক্রকেট, ১৮৩৪

"সরকার একটি ন্যস্ত সম্পত্তি, সরকারী কর্মচারীরা তাহার সংরক্ষক; এই ন্যস্ত ধন ও তাহার সংরক্ষক উভয়ই জনগণের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট।"

হেনরী ক্লে, ১৮২৯

আমেরিকা

"ভগবান যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের বুকে দিয়াছেন সেই স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসাই আমাদের নির্ভর। যে মনোবৃত্তি সর্বত্র সকল দেশে স্বাধীনতাকে সমস্ত মানুষের ঐতিহ্যরূপে স্বীকার করে, সেই মনোবৃত্তিকে রক্ষা করাই আমাদের আত্মরক্ষা।"

আব্রাহাম লিঙ্কন

"জনকল্যাণে, জনগণের দ্বারা চালিত, জনগণের সরকার এই পৃথিবী হইতে ধ্বংস হইবে না ..."

আব্রাহাম লিঙ্কন, ১৮৬৩

"যদি সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকালটিও লাগিয়া যায় তবুও আমি এই নীতির জন্যই যুদ্ধ করিব।"

ইউলিসিস্, এস্, গ্র্যান্ট, ১৮৬৪

"আমেরিকা গান গেয়ে চলেছে, সে বিচিত্র সুরের প্রার্থনাসঙ্গীত আমি শুনি..."

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্

"গণতন্ত্র, বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হও..."

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্

"যাহাই হোক না কেন, স্বাধীনতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে..."

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্

"যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সর্বোত্তম কবিতা...দিবারাত্রির ঘোষণার সঙ্গে এই দেশের জনগণের কার্যক্রম তুলনা করা চলে..."

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্, ১৮৫৫

"সরকারী কর্মচারীরা জনগণের সেবক, তাহাদের প্রতিনিধি, জনগণের কৃত আইন কার্যে পরিণত করাই তাহাদের কাজ।"

গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড, ১৮৮২

"শক্তির ভারসাম্য নহে, শক্তির গোষ্ঠী চাই; সংঘবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সংঘবদ্ধ শান্তি প্রচেষ্টা চাই…"

উড্রো উইলসন, ১৯১৭

"স্বাধীনভাবে আপন পছন্দমত ভাগ্য স্থির করিবার উপযুক্ত বাসস্থানের আকাঙ্ক্ষী সর্বত্র সকল মানুষের চিত্তে আমেরিকা বিরাজমান…"

উড্রো উইলসন, ১৯১৭

"আমরা গণতান্ত্রিক সংবিধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ও তাহা রক্ষা করিতেছি…এই নীতি দ্বারাই আমাদের নাগরিকদের অধিকতর নিরাপত্তা আমরা লাভ করি এবং তাহাদের অধিকতর সমৃদ্ধির সমান সুযোগ দিতে পারি…এই নীতি দ্বারাই আমরা সকল জাতির মধ্যে উত্তমরূপে ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক আদান প্রদান করিতে পারি…ইহার দ্বারাই আমরা পৃথিবীর সকল জাতির জন্য শান্তির ও প্রাচুর্যময় জীবনের আশার আলোক তুলিয়া ধরিতে সমর্থ…"

ফ্র্যাঙ্কলিন, ডি, রুজভেল্ট, ১৯৩৬

"চারিটি স্বাধীনতা…বাক্ স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, দারিদ্র্য হইতে স্বাধীনতা এবং ভয় হইতে স্বাধীনতা…"

ফ্র্যাঙ্কলিন, ডি, রুজভেল্ট

"ভগবানের নাম করিয়া অস্ত্র পাঠাও!…"

মার্কিণ সঙ্গীত, ১৯৪২

ইহাই আমাদের বক্তব্য। ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই রূপেই আমরা গড়িয়া উঠিয়াছি। ইহাই আমাদের পরিচয়। এই আমাদের বিশ্বাস। ইহাই আমেরিকা।